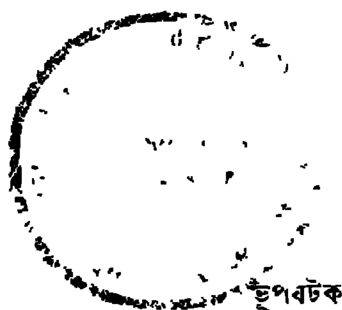


প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি

প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি



ভূপর্যটক

রামনাথ বিশ্বাস

পর্যটক প্রকাশনা ভবন
১৫৬ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ মে ১৯৪৫

পর্যটক প্রকাশনা ভবনের পক্ষ থেকে শ্রীঅতুল গুপ্ত কর্তৃক ১৫নং বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট হতে
পিপল্স্ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত ও ৫৭ মধুরায় লেন কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
যামিনী মোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

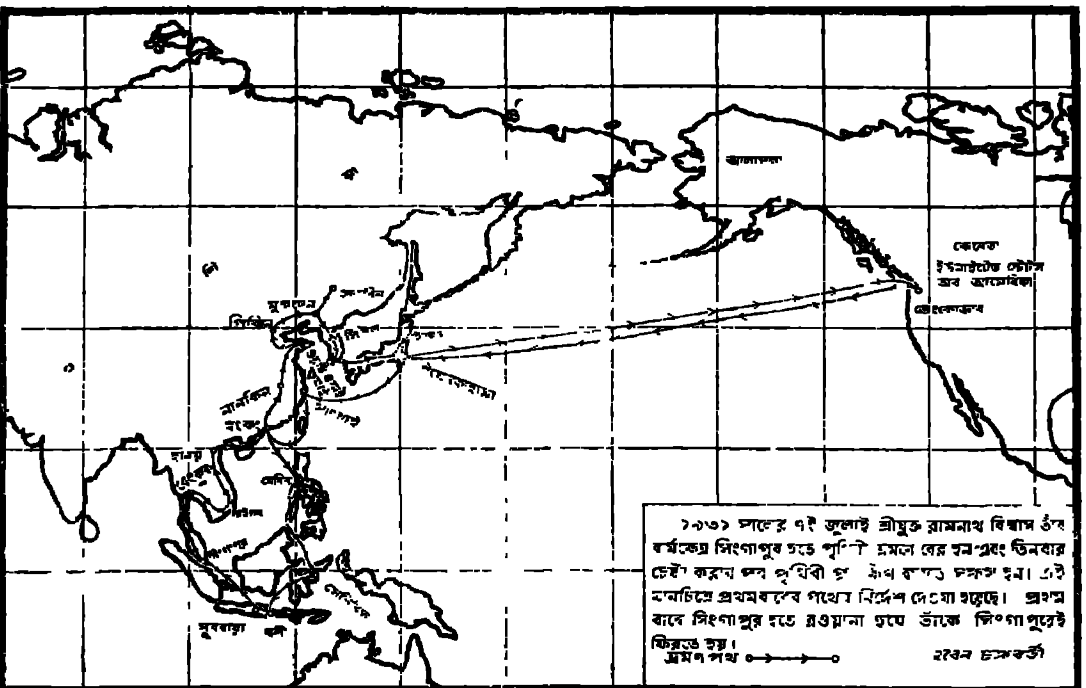


ভূমিকা

ফ্যাসিস্ত এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। সাম্রাজ্যবাদীরা পূর্বে অনায়াসেই অপরের স্বাধীনতা অপহরণ করেছিল। ফ্যাসিস্তরা বর্তমানে অপরের রাজ্য জোর-জবরদস্তি করে অপহরণ করতে ব্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদীরা ও ফ্যাসিস্তদের অনুকরণ করে তাদের অপহৃত রাজ্য বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, অতএব এদের ভিতরে কে ভাল কে মন্দ বিচার করে কোন লাভ নাই। উভয়ই মানব সমাজের শত্রু। প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তিতে তারই অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি করেছি মাত্র। ফ্যাসিস্ত নরঘাতী এবং সাম্রাজ্যবাদী হৃদয়হীন নরপশু কার্যসিদ্ধির জন্য হাত মিলাতে কসুর করে না। জাপান, আমেরিকা, কেনেডা এবং নিউজিল্যাণ্ডের ফ্যাসিস্ত এবং সাম্রাজ্যবাদীরা ইমিগ্রেসন আইন বজায় রাখতে একই পথ অবলম্বন করে চলত। অতএব জগতের মংগলের জন্য এই উভয় শত্রুর ধ্বংসের কামনা করা সকলেরই উচিত। আমি চাই পৃথিবী হতে ইমিগ্রেসন আইন লোপ হোক। মানুষ যেখানে ইচ্ছা সেখানে স্বচ্ছন্দ চিত্তে ভ্রমণে সক্ষম হোক।

পুঁজিবাদীর দুটি রক্ষা-কবচ আছে। সেই দুটি রাক্ষস সাম্রাজ্যবাদী রূপে অথবা ফ্যাসিস্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুটির সাহায্যেই পুঁজিবাদীরা সর্বসাধারণকে সকল রকমের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করে। আমার অন্তরের বাসনা সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদী সমেত পৃথিবীর পুঁজিবাদীরা লোপ হোক, তবেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে, এর পূর্বে পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না।

গ্রন্থকার


কেনেডা
ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা
মুকদেন
হংকং
সুরাবায়া
বালি
১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস তাঁর কর্মক্ষেত্র সিংগাপুর হতে পৃথিবী ভ্রমণে বের হন এবং তিনবার চেষ্টা করবার পর পৃথিবী ভ্রমণ কার্যে সফল হন। এই মানচিত্রে প্রথমবারের পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম বারে সিংগাপুর হতে রওয়ানা হয়ে তাঁকে সিংগাপুরেই ফিরতে হয়।
ভ্রমণ পথ
রবেন চক্রবর্তী



লেখক-জীবনের সূচনায় আমার রচনা সংশোধন করে দিয়ে যিনি আমার প্রতি অপরিসীম প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক ও গবেষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের উদ্দেশ্যে "প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি" কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হল।

প্রীতিমুগ্ধ

গ্রন্থকার



ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি

সাগর বক্ষে

টোকিওতে এসেই আমার জাপান ভ্রমণ শেষ হয়েছিল। সিংগাপুর হতে যখন পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছিলাম তখন ঠিক করেছিলাম পূর্ব দিক দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ আরম্ভ করে সূর্যটাকে সকালবেলা সামনে রেখেই পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করব। জাপান ভ্রমণ শেষ হয়েছে এখন কথা হ'ল কোন্ দিকে যাই? আমেরিকা আমার পথে আসে। কেনেডা হতে আরম্ভ করে চিলী পর্য্যন্ত রকি এবং আন্দিজ্ পর্বতমালা যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি করে দাঁড়িয়ে আছে ইমিগ্রেসন আইন। আমেরিকায় এশিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, উত্তর আমেরিকার কেনেডায় গেলে ক্ষতি কি? সে দেশটাও ত' আমাদের রাজার জাতেরই প্রজা। সেখানে গেলে হয়ত বিড়ম্বনা কম ও হতে পারে। তাই টোকিও থেকে বিদায় নিয়ে রেলগাড়িতে করে কোবিতে এসেই ভাংকোভারের টিকিট কিনতে মনোনিবেশ করলাম। যারা সমুদ্রগামী টিকিট কিনেছেন তারা বেশ ভাল করেই জানেন বিদেশে জাহাজের টিকিট কেনা কত শক্ত। কোবি হতে ভাংকোভারের ভাড়া হ'ল পঁচাত্তর আমেরিকান ডলার। ১৯৩২ সালের শেষ ভাগ। জাপানী ইয়েনের দাম কমে গেছে। পাঁচ ইয়েনে এক ডলার হয়। পূর্বে দুই ইয়েনে এক ডলার হ'ত। এন্, ওয়াই, কে অফিসে গিয়ে যখন টিকিট কিনতে দাঁড়ালাম তখন কাউণ্টারের ইউরোপীয় কেরানী বললেন, দেখি আপনার পাসপোর্ট? পাসপোর্ট দেখালাম। পাসপোর্টে কেনেডিয়ান লিগেসন্ অফিসার লিখেছিলেন—"Seen at the

Canadian Legation, Tokyo 17th. August 1932. The bearer is of nonimmegrant class and is informed that admission to Canada as a temporary visitor, is at the discretion of the Canadian immegration at port of entry, (Sd) Passport Officer."

শ্বেতকায় কেরাণী কেনেডিয়ান পাসপোর্ট অফিসারের মন্তব্য দেখে একটু দুঃখিত হলেন এবং পাসপোর্টখানা একজন জাপানী কেরাণীকে দিলেন। জাপানী কেরাণী শ্বেতকায় কেরাণীর দিকে চেয়ে বললেন, "Let him take a chance" এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ভয় করার কিছুই নাই, আপনার কাছ থেকে দু-ইয়েনে এক ডলার হিসাব করব। কেরাণীর কথায় আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে তৎক্ষণাৎ টিকিট কিনে ফেললাম এবং কথিত "chance" নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম।

পাঁচটার পূর্বেই আমি মিঃ রামাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সংযুক্ত প্রদেশের বাসিন্দা মিঃ শর্মার সাথে পথে বের হয়ে পড়লাম। পিটপিট করে বৃষ্টি পড়ছিল। শর্মা আমার সংগে না চলে ট্রামে করে জেটিতে গেলেন। আমি সাইকেলে করে পথ ধরে এঁকে বেঁকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হিয়েমারুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শর্মা আমার জন্য কয়খানা বই এনেছিলেন তা দেখালেন। তাঁর হাতে ছিল ফিজি দ্বীপ হতে প্রচারিত কয়েকখানা আর্যসমাজীর বই, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের একখানা "World Frederation" ফিজি হতে প্রচারিত বই খানাতে কয়েক পাতা ইংলিশ লেখাও ছিল এবং সেজন্যই বোধ হয় মিঃ শর্মা বইগুলি দিয়েছিলেন, কারণ আমি হিন্দি পড়তে জানতাম না। আসবার সময় পথে টোকিও হতে প্রকাশিত সেদিনের "টোকিও গার্জিয়ান" নামক একখানা ইংলিশ দৈনিক-ও কিনে এনেছিলাম।

এবার আমার জাহাজে উঠার সময় হয়েছে। দুজন জাপানী মজুর আমার সাইকেলখানা জাহাজে উঠিয়ে দিল এবং কোথায় রাখতে হবে তাই জিজ্ঞাসা করল। আমি তাদের একটা স্থান দেখিয়ে দিলাম। তারা সাইকেলটা রেখে মজুরী না নিয়েই চলে যাচ্ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম "মজুরী নেবে না?" একজন বিশুদ্ধ ইংলিশে বলল, "বিদ্রোহ বেঁচে থাক্"। কথাটা শুনে আমি ছিটকিয়ে গিয়ে দু-তিন হাত দূরে দাঁড়ালাম। বাপ্ রে এ আবার এ'ল কোথা হতে? বিদায় হ বাবা, তোদের সংস্পর্শে আসতেও চাইনা। আমরা বিদ্রোহের পক্ষপাতী নই। আমরা নরহত্যা একদম পছন্দ করিনা। আমাদের বিদ্রোহ হ'ল আধ্যাত্মিক। আমরা বৈদান্তিকভাবে মনে মনে বিদ্রোহ করি, বাস্তবের ধার-ধারি না। আমরা বাস্তবকে বলি 'ম্যাটিরিয়েলিজম'। শর্মা বেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হলেন ব্যবসায়ী। পৃথিবীর লোক ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জানে, অতএব জাপানী কমিউনিষ্টদের কথার কোন মূল্য ছিল না। শর্মা অল্প কিছু বুঝে বললেন, এতে ভয় করার কি আছে, ঐ যে কখানা বই দিয়েছি তাতেই স্বামী দয়ানন্দ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আধ্যাত্মিক বিদ্রোহ কেমন করে হয়। মরুগগে বেটারা মারামারি কাটাকাটি করে, আমরা মরলে পরে নির্বাণ পাব। পূর্বজন্ম না হলেই হ'ল, কেমন আপনি কি বলেন? বলার মত কিছুই ছিল না শুধু বললাম "এখন বিদায়"।

মহাশয় শর্মা তার ভগবানের নাম স্মরণ করে আমাকে হিন্দুমতে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আকাশ মেঘে ভরা, বাতাস বেশ বইছে। হঠাৎ জাহাজ নড়ে উঠল। জাপানীরা কাগজের সূতা ছাড়তে লাগল। তিন জন আমেরিকান্ যাত্রী ছিলেন তাঁরাও কাগজের সূতা ছাড়লেন। তীর হতে সেই তিনটি কাগজের সূতা তিনটি জাপানী স্ত্রীলোক ধরে ফেলল। উভয় পক্ষে কাগজের সূতার

অগ্র এবং পশ্চাৎ ভাগ ধরে ভাবের বিনিময় হতে লাগল। যতক্ষণ কাগজের সুতা-গুলি অটুট রইল ততক্ষণ একে অন্যে পৃথক হবার মর্মযাতনায় আনন্দ অনুভব করতে লাগল। সুতা যখন ছিঁড়ে গেল তখন আরম্ভ হ'ল রুমাল নাড়া। জাহাজ ক্রমেই সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মানুষের মূর্তিগুলি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সকলেই নিজ নিজ কেবিনে চলে গেল এবং জিনিষ গুছাতে মন দিল। আমি কেবিনে এসে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম এবং যে 'চান্স' নিতে যাচ্ছি তার কথা ভাবতে লাগলাম।

জাহাজ অন্দর দরিয়া ছেড়ে বাহির দরিয়ায় এল। সমুদ্র একেবারে শান্ত। জাহাজ বেশ জোরে চলেছে। জাহাজ যখন দ্রুত চলে তখন বেশ ঝাঁকানি দেয়। আমি সে ঝাঁকানি বেশ অনুভব করছিলাম। শুয়ে থাকতে মোটেই ভাল লাগল না। নিজের পিঠ-ঝোলা হতে সেদিনের সংবাদ-পত্র খানা এবং শর্মার দেওয়া বইগুলি একটু পড়ে দেখে স্নানাগারে গিয়ে স্নান করলাম। এতে অবসাদ অনেকটা দূর হল। রাত্রে শুবার সময় দেখি সংবাদপত্র খানা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কোথায় ফেলতে পারি? বিকালবেলাও সংবাদপত্র খানা দেখেছি সে কথা বেশ মনে ছিল। এত সংবাদপত্রে জাপানের তরফ থেকে আমেরিকাকে হুমকী দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ ছিল। তবে কি কোন জাপানী তা আমার কেবিন থেকে নিয়ে গেল? যদি নিয়ে থাকে নিক্, আমার তার জন্য বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। পলিটিক্স আমাদের চিন্তনীয় বিষয় নয়, আমরা মরলে পরে নির্বাণ পাব।

পরদিন প্রাতে সূর্য উঠবার পূর্বেই ঘুম থেকে উঠলাম। তখন জাহাজ পরিষ্কার হচ্ছিল। পায়খানাতে গিয়ে একটি লোককে দেখলাম সে পায়খানা পরিষ্কার করছে, আবার সেই লোকটিকেই সকালে খাবার দিতেও দেখলাম।

সে আমাকেও খাবার দিয়েছিল। আমি তার দেওয়া খাবার খেয়েছিলাম আর ভাবছিলাম স্বদেশের মেথরদের কথা।

ছিয়ে মারুতে সংবাদপত্র ছাপান হয় এবং প্রত্যেক যাত্রীকে একখানা করে বিতরণ করা হয়। আমিও একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পেলাম। সংবাদ অতি সামান্যই ছিল তবুও কাগজখানা বেশ ভাল করে পড়লাম। চীনের সংগে জাপানের যুদ্ধের নাম গন্ধও সেই সংবাদপত্রে ছিল না। ভারতে হিন্দু-মুসলমান লড়াইএর সংবাদ ছিল এবং মহাত্মা গান্ধি মিঃ আম্বেদকারকে সুপথে আনার জন্য উপবাস করবেন তারও ইংগিত ছিল। ইংলিশ ষ্টারলিংএর দামও নেমে যাচ্ছিল দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। সেদিন কারো সংগে কথাই বললাম না শুধু সেই হারানো সংবাদপত্রখানা ভাল করে খুঁজে যখন পেলাম না তখন একটা সন্দেহের আবরণ আমার মনকে ঢেকে ফেলল।

তার পরদিন প্রাতে জাহাজ ইয়াকোহামাতে এসে লাগল। প্রায় যাত্রীই নেমে গেল, আমিও নামলাম এবং শহর হতে ফের নতুন সংবাদপত্র কিনে আনলাম। সেদিনের সংবাদপত্রে আমেরিকাকে জাপানের তরফ থেকে হুমকী দিয়ে কোন প্রবন্ধ ছিল না।

বেশিক্ষণ শহরে থাকলাম না। দুপুরবেলা জাহাজে ফিরে এসে দেখি যাত্রীর দল আসতে আরম্ভ করেছে। বেলা দুটার সময় সকল যাত্রীই এসে গেল এবং ঠিক দুটো দশে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজে উঠার সময় একজন জাপানী যুবককে পেলাম, সেও যাবে আমেরিকায়। সিয়াটেল হ'ল তার জন্মস্থান। দুঃখের বিষয়, সে একটিও ইংলিশ শব্দ জানত না। তার জন্মের কয়েক মাস পরই তার মা-বাবা স্বদেশে চলে আসেন, হঠাৎ তাদের মনে হয়েছে ছেলেকে আমেরিকাতে পাঠাতে হবে তাই তাকে আমেরিকায় পাঠান হচ্ছে। ছেলেটির শরীরের রং সাদা, অবয়ব অনেকটা নরডিক ধরণের। এরূপ ছেলে

জাপানীদের হতে পারে না বলেই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু আজ হতে মত বদলাতে বাধ্য হলাম। আর মনে মনে জাপানী নারীদের নমস্কার জানালাম তাদের স্বদেশ-প্রেম দেখে। জাপানী নারী পর-পুরুষেরও সংগে বাস করে যদি তাতে তার স্বদেশের কোন উপকার হয়। বিদেশির দ্বারা সন্তান জন্মানো জাপানী রমণীদের স্বদেশ-প্রেমের একটি অংগ। আমাদের দেশেও এ প্রথাটি ছিল, এখন তা লোপ পেয়েছে।

জাপানী অথবা অর্দ্ধ-আমেরিকান যুবকটি আমার সংগে কয়েক মিনিটের মাঝেই ভাব করে নিল এবং সেদিন বিকালে জাপানী ভাষায় আমার সংগে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগল। ছেলেটি যাতে দমে না যায় সেজন্য আমি হাঁ হু করে তাকে কথা বলতে উৎসাহিত করছিলাম। বিকালে খাবার খেয়ে সে তার কেবিনে চলে গেল, আর আমি নানা চিন্তায় অস্থির হয়ে প্রথম কেবিনে এসে শেষে ডেকে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম।

তিনটা দিন কেটে গেছে। নানা লোকের সংগে পরিচয় হয়েছে। তারপর ইমিগ্রেসন বিভাগের সংবাদও অনেক জেনেছি। মন ভয়ানক খারাপ হয়েছিল। রাত গভীর। প্রশান্ত মহাসাগরের জল তখন নীরব, নিস্তব্ধ। নীরবতা পুরা রকমেই বিরাজ করছিল। জাহাজের প্রপেলারটাই শুধু জলে আঘাত করছিল এবং সেই আঘাতের ধ্বনি এতই মৃদু যে জাহাজের অগ্রভাগে যারা ছিল তাদের কানেও সে ধ্বনি পৌঁছচ্ছিল না। আকাশের তারাগুলি ঝিকমিক করছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা উল্কা আকাশ হতে খসে সাগরের জলে ঝাঁপ দিচ্ছিল। আমি কখনও আকাশের দিকে, কখনও নীরব নিস্তব্ধ কালো জলের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মনে পায়চারী করছিলাম। যাত্রীরা সকলেই নিদ্রিত। কিন্তু আমার চক্ষে একটুও ঘুম আসছিল না। কেন ঘুম আসছিল না, তার কারণ আমি জানতাম। আমার মন তখন চিন্তায় জর্জরিত ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কেনেডায়

আমাকে নামতে দেওয়া হবে না। যেদিন ইয়াকোহামাতে জাহাজে চড়েছি সেদিন থেকেই আমার বন্দী-জীবন আরম্ভ হয়েছে। আমার বন্দী-জীবন কারাগারের বন্দী-জীবনের মত হবে না। জাহাজ যখন ভেংকোভারে পৌঁছুবে তখন আমাকে কয়েক দিনের জন্ম ভাংকোভার বন্দরের ডিটেন্‌সন গারদে আটকিয়ে রেখে ছলে-বলে-কৌশলে হিয়ে মারুতেই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমার প্রতি এরূপ অন্যায় কেন করা হবে তাই আমি ভাবছিলাম।

আমার শরীরের রং-এর জন্ম আমি দায়ী নই। আমি যে দেশে জন্মেছি সে দেশের পরাধীনতার জন্মও আমি দায়ী নই। আমি শুধু আমার মাতৃভূমির কাছে একটি বিষয়ে দায়ী ছিলাম এবং সেই বিষয়টিতে আমি উদাসীনও ছিলাম। সেটি হ'ল আমি আমার জাতের স্বাধীনতার জন্ম লড়াই না করে আরামের তীর্থযাত্রা করেছিলাম। যখন আমি তীর্থযাত্রা শুরু করেছিলাম তখন দেশমাতার কথা আমার মনেই ছিল না। তখন মনে ছিল স্বর্গ আর নরক, পাপ আর পুণ্য। তারপর যখন আরও একটু জ্ঞান হ'ল তখন ভাবছিলাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র আমি সমান ব্যবহারই পাব, কিন্তু এক দিন জাহাজে থাকার পরই সকল কথা বুঝতে পারলাম। শুধু তাই নয় আরও বুঝতে পারলাম দরিদ্রের এ সংসারে সুখ বলে অনুভব করবার কিছুই নাই।

আমার মাথার চুল তখন বাতাসে উড়ছিল এবং মাঝে মাঝে মুখের উপর, কখনও চোখের পাতার উপর সজোরে আঘাত করছিল। সে আঘাতে অনভ্যস্ত থাকায় বেশ কষ্ট পেতে হচ্ছিল। তবুও আমি প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলাম, শান্ত হব বলে, কিন্তু শান্তি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল, অশান্তি এসে আমার মনকে কামড়ে ধরছিল। আমার মন তখন বড়ই চন্‌চল ছিল। দুঃখের বিষয় আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে এবং ভগবানে মাথা নত করে প্রেমভরে

কাঁদে তারা তাদের ভগবানের ঘাড়ে সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে শান্তির ক্রোড়ে তাড়াতাড়ি স্থান করে নেয়, কিন্তু আমার সে পথও বন্ধ থাকায় অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল আর আমাকে দহন করছিল। সেজন্য একাকী ডেকে দাঁড়িয়ে কখনও আকাশের কখনো গাঢ় নীল জলের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর রাগে অন্ধ হয়ে আমারই ঠোঁট শক্ত করে দংশন করছিলাম। ডেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তারপর আর ভাল লাগল না; একটা বেন্‌চে গিয়ে বসলাম।

নাবিকেরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল, তারা ভেবে বোধ হয় পাচ্ছিল না কেন আমি অসময়ে ডেকে একাকী বসেছিলাম। ওদের প্রতি আমার হিংসা হচ্ছিল কারণ ওরা নাবিক। যে কোন বন্দরে ওরা নামতে পারে, বন্দরে বেড়াতে পারে এবং দরকার বোধে ফিরেও আসতে পারে। কিন্তু আমার সে অধিকার ছিল না। আমার টাকা নাই, আমি সামান্য মানুষ। সামান্য মানুষের স্থান এ পৃথিবীতে নাই। যারা দরিদ্র তারা জন্ম নেয় আর মরে এবং যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তারা শুধু বেগার খেটেই জীবন কাটায়। আমি সেই শ্রেণীর লোক। আমার কি বাঁচা উচিত না প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত—কোনটা? জলে ঝাঁপ দিলে নিশ্চয় আমি মরব, কিন্তু যে দোষে আমি দোষী সেই দোষ দরিদ্রদের কাছে বলা আর হবে না। আমার মরা হবে না, আমি বাঁচব আর পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুর্বল দরিদ্র মানবের ইতিহাস যত পারি তত বলব। আমি জানি হাজার বৎসর আমার পূর্বপুরুষগণ মহাপাপী হয়ে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সে পরাধীনতা আজ নগণ্য, আজ দেখছি একদিকে বর্ণভেদ, অন্যদিকে বর্ণাভিমানী নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে নিজের ভাইএর গলায় ছুরি চালাতে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করছে না। অতএব এই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, পৃথিবী হতে

বর্ণভেদ এবং দরিদ্রতা যাতে লোপ হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব, তা না হলে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তির পরিসমাপ্তি হবে না।

গভীর রাত। কত অসম্ভব দুরাশায় আমার চোখে ঘুম নাই। যে কেবিনটাতে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেখানে আমি একাকী। আমার কেবিনে জাপানী বা ইউরোপীয় কেউ থাকতে রাজী নয়, কারণ আমার শরীরের পরাধীনতার দুর্গন্ধ যদি তাদের শরীরে লাগে তবে তাদের শরীর পংকিল হয়ে যাবে। পরাধীন জাতির সংগে এক কেবিনে থাকতে রাজী হয় ইহুদী এবং সোভিয়েট রুশ। কেনেডা হতে যখন ফিরছিলাম তখন একজন বাইলো রুশিয়ান্ কমিউনিষ্ট এবং একজন ইহুদী আমার সংগে একই কেবিনে শুতো, কথা বলত—কোনরূপ ঘৃণাবোধ করত না। আরব, তুরুক, ইরাণী, জাপানী এমন কি জাতীয়ভাবাপন্ন চীনা পর্যন্ত আমার কেবিনে থাকতে পছন্দ করেনি। একে একে তারা আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল আর এই দুটি প্রাণী আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না বলে আশ্বাস দিয়েছিল। ইহুদী যাচ্ছিল মানচুরিয়ায় তার ভাইবোনদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করতে, আর লাল রুশটি যাচ্ছিল ব্লাডিভষ্টকে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌কে চিরতরে পরিত্যাগ করে।

কেবিনে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তাই বাইরে বসে ভারতের বাইরে ভারতবাসীর কথা ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে চীনের গরিলা ও জাপানের ব্ল্যাক ড্রেগনদের কথাও মনে হচ্ছিল।

আর দশ দিন পর জাহাজ ক্যানেডায় পৌছবে। তথায় আমাকে বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে। সেজন্য মনের যন্ত্রণা ক্রমাগত আমাকে আকুল করে তুলছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিকের শীতল বায়ু আমার কপালের শিরাগুলির প্রশস্ততা কমাতে পারছিল না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর পায়চারী করতে লাগলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম জাপানীদের যেমন জাতীয়-

ভাবের আবেগে প্রাণ দেয় আমিও দরিদ্রের নামে, সর্ব্বহারার নামে, তথাকথিত হীণ বর্ণের নামে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জাহাজটার পিছন দিক দিয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জাপানী জাহাজে করে আমেরিকায় যাচ্ছিলাম বলেই জাপানীদের কথা বলতে হচ্ছে। পা এগিয়ে চলল মন আনন্দিত হল, কিন্তু মরা আমার হল না। একটি আমেরিকান আমারই মত জলের তরংগ গুণছিল। আমাকে দেখে সে দাঁড়াল, তারপর আমাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসাল। আমি তার পরিচিত, সে জাতে পোল। সেছিল দরিদ্রের বন্ধু। যাত্রীদের অনেকেই সে কথা জানত। সে জন্য অনেকে তাকে ঘৃণা করত। সে আমারই মত চীনের নবজাগরণের পক্ষপাতী ছিল আমারই মত সে চিয়াং কাইসেককে ঘৃণা করত, এবং সকলের কাছে তা প্রকাশ করায়, জাপানী, বৃটিশ, আমেরিকান্ সবাই তাকে বয়কট করেছিল। আমি কখনও আমার মনের ভাব প্রকাশ করিনি বলে কেউ আমাকে ঘৃণা করার সুযোগ পায়নি কিন্তু যখনই এই পোল যুবকের সংগে সাক্ষাৎ হ'ত তখনই বলতাম, মানচুরিয়া দেশটাকে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানীর কাছে বিক্রি করেছে—জাপান মানচুরিয়া জয় করেনি।

পোল যুবক নিজকে আর্য্য বলে পরিচয় দিত। রুশদের নামের সংগে তার নামের সম্বন্ধ ছিল। "ইস্কি" শব্দ তার নামের শেষ ভাগে এসেই নামের শেষ হয়েছিল। ইস্কি বলেই আমি তাকে ডাকতাম। ইস্কি আর্য্য বলে পরিচয় দেয় বলে আমার সংগে তার মনের মিল হ'ত না। তাকে আমি ঘৃণা করতাম, বলতাম কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক, তার জাতের পরিচয়ের কোন দরকার নাই। কিন্তু ইস্কি বলত, কমিউনিষ্টরা জগতে যার যা প্রাপ্য তা দিতে পারে, শরীরের রক্ত বদলাতে পারে না। আমি বলতাম রক্ত লালই হয়, কালো কখনও হয় না। ইস্কি হাসত আর বলত জ্ঞানবৃদ্ধ দেশের লোক, আগে আমার মনোভাব পাও তারপর বুঝবে, জাত—জাতের বৈরী নয়,

পুরাতন ধনবিজ্ঞানই জাতের বৈরী। আমার মনের অশান্তিতে সে অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিত আর হাসত। আজ আমাকে মরণের জন্য তৈরী দেখে ঠিক সেই ভাবে হেসেই আমার হাত ধরে বল্ল, আপনি ত ব্ল্যাক ড্রেগনের মেম্বর নন তবে কেন মরণের জন্য তৈরী হয়েছেন। চলুন ডিস্‌কাসন করি, কিন্তু ধীরে কথা বলতে হবে। যদিও সাম্যবাদের ক্ষীণ বাতি আমার মনের এক কোণে মিট মিট করে জলছিল তবুও শ্বেতজাতির জাত্যাভিমান, শ্বেতজাতির সাম্রাজ্যবাদ আমাকে কাঁপিয়ে তুলছিল। যাঁরা বর্ত্তমানের হিটলার-জীবনী "ম্যান ক্যাম্ফ" পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন হিটলার বলেছেন "ভারতবাসী গোলামের জাত, এদের গোলাম হয়েই থাকতে হবে।" অতীতে তার আভাস আমি পেয়েছিলাম তাই শ্বেতজাতের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহভাব জেগে উঠছিল। ইস্কির সাম্যবাদ তাতে জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছিল। ট্রটস্কির পৃথিবীর প্রলিটেরিয়েট বিদ্রোহ মন হতে অপসরণ হয়ে ষ্টালিনের কর্ম্মপদ্ধতির চিন্তা আমার মনে তোলপাড় করছিল। টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ এঁদের অবাস্তব মানুষ বলেই হেসে উড়িয়ে দিতাম। আজ এই সম্বন্ধে ইস্কি এবং আমি উভয়ে আলোচনা করতে করতেই রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। বুঝছিলাম, টলষ্টয় এবং রবীন্দ্রনাথকে বাক্যবাগীশ বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মানব জাতির উন্নতির দিকে তাঁদের দাগ অনেক কিছুই রয়েছে।

পূর্ব্বের আকাশে সূর্য্যের লাল আভা এসে দেখা দিল। সমুদ্রের প্রবল ঢেউ কমে গিয়ে শান্তভাব ধারণ করল। আমি ইস্কিকে বললাম, মিঃ আর্য তোমাদের দেবতাকে প্রণত হয়ে ভক্তি প্রদর্শন কর। ইস্কি হাসল তারপর আমাকে নিয়ে কেবিনের দিকে চলল। আমি তৃতীয় শ্রেণীর অন্ধকারময় একটা কেবিনে প্রবেশ করে বাতি জ্বালাতেই মনের মধ্যে একটা অন্ধকারভাব এসে দেখা দিল, আর ইস্কি যখন তার কেবিনে গেল হয়ত প্রভাতের সুন্দর

আলো তার ধবধবে বিছানার উপর পড়ে তার উজ্জল মুখ আরও উজ্জল করছিল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নাই, কিন্তু একটা ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। খাবারের ঘণ্টা পড়ল। যদিও আমি অনার্য তবুও আর্য খাদ্য দুধ, যব, মাখন, রুটি খাবার জন্য অস্থির হয়েছিলাম, কিন্তু উপায় নাই, আমি দরিদ্র, আমার পেট ভরে খাবার অধিকার নাই, তাই ধীর পদনিক্ষেপে দুর্গন্ধযুক্ত জাপানী খাদ্য খাবার জন্য টেবিলে গিয়ে বসতে বাধ্য হলাম। জাপানীদের খাদ্যের প্রতি আমার কোনরূপ রাগ হল না, রাগ হল আমার দরিদ্রতার জন্য। কেন আমি দরিদ্র হলাম, কে আমাকে দরিদ্র করল এই চিন্তাই তখন আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি যেমন দরিদ্র, স্বাধীন জাতের স্বাধীন লোকের মাঝেও তেমনি অনেক দরিদ্র আছে। তারা দরিদ্র হয় কেন? তারাও ত খেতে পায় না, ইচ্ছা মত কোথাও যেতে পারে না, মুখ খুলে কথা-ও বলতে পারে না। তবে কেন আমি শুধু শ্বেতকায়দের ঘৃণা করি? যারা পৃথিবীতে দরিদ্রতা এনেছে, তারাই আমার জাতকে, আমার দেশকে পরাধীন করেছে, আর কেউ নয়। খাবার সমাপ্ত করেই ইস্কির কাছে গিয়ে আমার মনের কথা বললাম। সে বলল আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঠিক, যদি জেহাদ ঘোষণা করতে হয়, তবে ঐ পুঁজিবাদী শয়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, কোন জাতের বিরুদ্ধে নয়। জাতীয় ভাবের ঠুলি চোখে পরিয়ে পুঁজিবাদীরা এক শ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডা দলে টেনে আনে, তাদেরই বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী।

ইস্কি রুশিয়ায় এক বৎসর ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন। কত বাধা বিপত্তির মাঝ দিয়ে সোভিয়েট রুশিয়ার লোক কাজে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে তারই কথা বলছিলেন। জুতার কাদা পরিষ্কার করতে তাকে কত বেগ পেতে হয়েছে সে কথাও তিনি বলতে ভুলেন নি। তারপরই বললেন আর জুতায় কাদা লাগবে না, সোভিয়েট রুশিয়ায় এবার

পথগুলিতে পিচ দেওয়া হবে এবং আমেরিকার ধরণে সিমেণ্টের ঘর হবে। হঠাৎ কথার গতি পরিবর্ত্তন করে ভবিষ্যতের যুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হবে প্রশান্ত মহাসাগরে। তখন বুঝিনি এত শীঘ্র বর্ত্তমানের অবস্থায় আমরা এসে পড়ব। তারপর বর্ত্তমানের অবস্থা বদলে গিয়ে এমন এক পরিবর্ত্তন আসবে, যা আমরা মোটেই আশা করতে পারি না। আজ দেখছি জাপান চীনের বুকের উপর চড়ে বসেছে, কাল হয়ত দেখব জাপানের ধনীরা চীনা গরিলার কৃপা প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইস্কি যাবেন চিকাগো, সিয়েটেল্ হয়ে।. তিনি চিকাগোর কথা আমায় কত শুনাতেন তার হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যতই তাঁর কথা শুনতাম ততই মনে হ'ত কবে আমি আমেরিকায় যাব, আর দেখব আমেরিকান্দের উন্নতি।

সাম্রাজ্যবাদীরা বলে, একদেশের বেকার মজুর অন্য দেশে গেলে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। কথাটা একদম বাজে। পৃথিবীকে গড়ে তোলার পক্ষে লোকের সংখ্যা খুব কম অথচ পুঁজিবাদীদের প্রতিবাদেই আহাম্মক মজুরগণ জাতীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় অনেক সময় বিদেশী মজুরকে আপন দেশে আসতে নিষেধ করে। যেমন বর্ত্তমানে আমরা বলে থাকি 'বাংগালীর জন্য বাংগা' এ কথাটা একদম বাজে। আমার মনে হয় এই কথার পেছনে রয়েছে হিংসা পলিসি। ইস্কি আমাকে বলেছিলেন চিকাগোতে নাকি বর্ত্তমানে ভারতবাসী কাজ পায় না। যখন চিকাগোতে গিয়েছিলাম তখন দেখছিলাম তাঁর কথাটা একদম খাঁটি। কিন্তু এ সবের পরিণতি পুঁজিবাদীর দল অনেক সময়ই ভাবে না, তাই তাদের তাসের ঘরে আগুন লাগবে এবং সেই তাসের ঘর পুড়ে ছারখারও হবে।

মালয় দেশ হতে একজন ইউরোপীয়ান কেনেডায় যাচ্ছিলেন। তাঁর

ছেলেটি একটি নিরেট মূর্খ বলেই আমার সংগে এসে পরিচয় করল। এসেই আমাকে মালয় ভাষায় বলল—তুই কোথা হতে আসছিস ?

সিংগাপুর হতে।

কেনেডায় গিয়ে কি কাজ করবি ?

জানি না।

কেন, মালয় দেশেত বেশ পয়সা আছে। ভাল লাগল না বুঝি ? কেনেডায় যে সবাই সাদা লোক, তোর মত লোককে সেখানে প্রবেশও করতে দেবে না, জানিস তা ?

হাঁ, জানি।

তবে আর এত কষ্টের টাকা এমন করে খরচ করবার কি দরকার ছিল ?

সে আমার ইচ্ছা।

ছেলেটি যা বুঝেছে তাই বলেছে। মালয় দেশে আমাদের দেশের লোক কুলির কাজই করে বেশি। ছেলেটির জন্ম হয়েছে রবার বাগিচায়। বড় হয়েছে ভারতীয় কুলিদের মাঝেই। তাই কথা বলার মধ্যে কোন ভদ্রতা ছিল না। আমি ছেলেটিকে দোষ না দিয়ে আমাদের জাতের উপর রাগ করছিলাম। এখনও আমরা মজুরদের মধ্যে নীচ জাতীয় হিন্দুদের এবং দরিদ্র মুসলমানদের মানুষ বলে স্বীকার করি না। অপরে যদি সেরূপ ভাব পোষণ করে তবে দোষের কিছুই নাই।

আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ..ট তার বাবাকেও ডেকে আনল। আমাকে দেখে তার ম... শুকিয়ে গেল। তিনি অতি বিনয় করে বললেন,—কোথায় যাবেন ?

কেনেডায়।

আপনি কোথায় যাবেন ?

আমিও কেনেডা যাব।

বেশ, কিন্তু মালয় দেশ কি অপরাধ করেছে?

আমার চাকুরি গেছে, এখন কেনেডায় গিয়ে দেখব কোনরূপ গোলাবাড়ী করতে পারি কি না? আপনাদের দেশের একজন লোকের কাছেই পোলটি শিক্ষা করেছি, হয়ত তাই করব।

দয়া করে ছেলেটির মতিগতির পরিবর্তনের দিকে মন দেবেন। কেনেডায় কিন্তু তামিল কুলি পাবেন না। মাদ্রাজী কুলিরা বড়ই আহাম্মক হয়। কেনেডায় নিগ্রো আছে বটে তবে তামিল কুলির মত নয়।

তা আমি জানি, ছেলেটা বোধ হয় আপনার সংগে ভাল ব্যবহার করেনি?

সেজন্য কিছুই হয়নি, যেমন শিখেছে তেমনই বলেছে, তাতে আর দোষ কি?

ছেলের মা কাছেই ছিলেন। তিনি ছেলেকে ভাল ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়ে আমাকে তুই-তুকারী করার জন্য ক্ষমা চাইতে বললেন। ছেলেটি ক্ষমা চাইল এবং তিনজনে মিলে আমার কাছ হতে বিদায় নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

মিঃ ইস্কি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলেন। ওরা চলে গেলে কাছে এসে বললেন,—বুঝতে পারবে ওরা কেনেডায় গিয়ে পোলটি করা কাকে বলে। মালিক হবার সম্ভাবনা খুবই কম, মজুর এবং মালিকে প্রভেদ এত বেশী যে রবার বাগিচার তামিল কুলি এবং ইউরোপীয় ম্যানেজারে যে সম্বন্ধ, কেনেডায় ধনী এবং মজুরে সেই সম্বন্ধ বললেও দোষ হয় না। তামিল কুলিদের আত্মসম্মান বোধ জাগেনি, আর ওদের জেগেছে। তামিল কুলি পরাধীন দেশের মজুর আর ওরা স্বাধীন দেশের মজুর। অভাব কাকে বলে তামিলদের এখনও তা বুঝবার সুযোগ হয়নি আর ওদের তা হয়েছে। তামিল

কুলি অশিক্ষিত আর এরা শিক্ষিত উভয়ের মধ্যে এতখানি প্রভেদ থাকা সত্বেও উভয় দেশের মজুর একই রকমের ব্যবহার পেয়ে থাকে।

একটি ইউরোপীয়ান যুবক কেনেডায় যাচ্ছে। তার কাছে আছে মাত্র দু ডলার। তার জন্ম হয়েছে জাপানে, শিক্ষা পেয়েছে জাপানে। জাপানী এবং ইংলিশ উভয় ভাষাই সে সমান ভাবে বলতে পারে। সে কোনদিন জাপানের বাইরে যায়নি। সে দু ডলার সম্বল করেই কেনেডায় প্রবেশ করতে পারবে। আমার কাছে ছিল দুই শ ইয়েণ, এক শ ডলার এবং পঁচিশটি ষ্টার্লিং; এতগুলি টাকা হাতে থাকা সত্বেও আমার কেনেডায় প্রবেশ নিষেধ হবে। একেই বলে বর্ণবিদ্বেষ এবং পরাধীনতার শাস্তি।

আমাদের দেশের যে সকল ধনীর ছেলে বিদেশে যায়, তারা একবারও চিন্তা করে না তাদের প্রকৃত অবস্থা কি? তারা পথে-ঘাটে যে মানইজ্জত পায় তা শুধু টাকার দৌলতেই। যাদের পিতামাতা অন্যের রক্ত শোষণ করে নিজেদের শিক্ষিত এবং বংশজ বলে পরিচয় দেয়, যারা অপরের পাদুকা মাথায় রেখেও বলে আত্ম-সম্মান যায়নি, তাদের ছেলেপিলে বিদেশ হতে ফিরে এসে সত্য কথা বলবে আর আমরা তার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাব তা বিশ্বাস করা নিছক বেকুবি ছাড়া আর কি হতে পারে? এসব বিষয় অবগত ছিলাম না বলেই প্রত্যেকটি বিষয় আমার কাছে যেমন নূতন লাগছিল তেমনি প্রত্যেকটি বিষয়ই আমার মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষয় করছিল।

শীতের সময় এদেশে প্রভাত-সূর্য প্রায়ই দেখা যায় না। হঠাৎ সূর্য পূর্বাকাশে যেন লাফ দিয়ে উঠে জগতের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। সকালে এক রকম ঘন-কুয়াশার আবরণ আকাশটাকে ঢেকে রাখে। আকাশ যখন কুয়াশায় আবৃত, আমাদের জাহাজ ছিয়ে যায় তখন ধীরে এবং অতি সন্তর্পণে ভেংকোভার শহরের ভেংকোভার প্রণালী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

প্রণালীর দুদিক ওক্ এবং পাইন জাতীয় বৃক্ষে আবৃত ছিল। টালি দিয়ে ছাওয়া দু-এক খানা কুঁড়ে ঘর খাড়া পাহাড়ের গায়ে মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে ছিল। ডিটেন্‌সন্ ক্যাম্পে যাবার সময় সংবাদ নিয়ে জেনেছিলাম কেনেডাতে দুই শত কোটী লোক বেশ সুখে এবং আরামে বসবাস করতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে, যদি পৃথিবীর সকল লোককে কেনেডায় এনে বাস করতে বলা হয়, তা হলে কেনেডাতে লোকারণ্য হবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবুও কতকগুলি লোক আগন্তুক দেখলেই চেঁচিয়ে উঠে এবং বলে নবাগত তাহাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে, বিদেশীকে তাড়াও।

১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে উত্তর আমেরিকায় এক মারাত্মক সময় এসেছিল। মজুর দৈনিক আট ঘণ্টা খাটার পর মাত্র তেত্রিশ সেণ্ট মজুরী পেত, এতে তাদের এক বেলার খাবারও জুটত না। এমতাবস্থায় মজুর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নবাগতের উপর অত্যাচার করতেও কসুর করত না।

জাহাজ ক্রমেই সমুদ্রতীরের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। যাত্রীদের অভ্যর্থনা করার জন্ম তাদের আত্মীয়-স্বজনরা কূলে এসে ভীড় করতে লাগল। এরই মাঝে ইমিগ্রেসন বিভাগ জাহাজে উঠে পাসপোর্টগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আমাকে কেউ ডাকল না। একে একে যখন সকল যাত্রী চলে গেল তখন আমার পাসপোর্ট না দেখেই একজন লোক এসে আমায় বলল, চলুন। আমার সাইকেল এবং পুঁটলীটা ক্রেণের সাহায্যে নামিয়ে নিয়ে একটা মটরকারে রাখল।

মটরকারটা আমাদের দেশের কয়েদী নেবার মটরকারের মতই। বুঝলাম এবার আমি জেলে যাচ্ছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের মটরকার একটা

প্রকাণ্ড জেলের ফটকে এসে দাঁড়াল। আমি নামলাম। আমার সাইকেল নামানো হল না, গুদামে নিয়ে রাখা হ'ল। পুঁটলীটা নিয়ে গিয়ে লিফ্টে দাঁড়ালাম। লিফ্ট এক উর্ধমুখী টানে আমাদের ছয় তলাতে নিয়ে হাজির করল। তারপর যে দৃশ্য আমার নয়নপথে এল তা দেখতে ভাল লাগল না। আমি মুখ ফিরিয়ে নির্ধারিত রূমে প্রবেশ করতেই বাহির হতে দরজার তালা চাবি লেগে গেল। এতক্ষণে আমার অনুমান সত্য হল।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে রূমের ভেতর কি আছে তা দেখতে লাগলাম। রূমটি বেশ বড়, তিরিশ হাত চওড়া এবং পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা। সর্বপ্রথমই দুটি লোহার খাটের উপর দৃষ্টি পড়ল। খাটে স্প্রিং ছিল না। কয়েদীর পক্ষে স্প্রিংবিশিষ্ট খাটের কথা চিন্তা করাও অন্যায়। খাট দুখানার একটু দূরেই একটি লম্বা টেবিল তার দু' পাশে দু খানা লম্বা বেন্‌চি। বেন্‌চি দুটিতে এবং টেবিলটিতে নানারূপ খোদাই অক্ষর। কয়েদীরা তা খুঁদেছে। তারপর ইচ্ছা হল রেষ্টরূমও আছে কিনা দেখি। রূমের একদিকে একটি বৃহৎ দরজা। অর্গলটি খুলে ভেতরের দিকে চেয়ে দেখলাম, আমার ধারণা ঠিকই। কাছেই টয়লেট। গরম জলের পাইপটাতে ঠেলা দেওয়া মাত্র তোড়ে গরম জল পড়তে লাগল। ভাবলাম এরা যদি বিছানা না ও দেয় তবে অন্ততপক্ষে গরম জল দিয়ে শরীর গরম করতে পারব। দেখবার আর একটি জিনিষ ছিল, সেইটা হল হিটার। হিটারটা খুলতেই ঘর গরম হতে দেখে আরও আনন্দ হল। উত্তাপ যখন আশি ডিগ্রিতে উঠল, তখন হিটার বন্ধ করে টেবিলে এসে খোদাই অক্ষরগুলির পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ শুনে দরজার দিকে মুখ করে বসলাম।

একটি বৃদ্ধ লোক আমার জন্য বিছানা নিয়ে রুমে প্রবেশ করল। লোকটা রুমে প্রবেশ করে বিছানার আসবাব মেজেতে রেখে দরজাটা

কের ভেতর দিকে বন্ধ করে কাজে মন দিল। ভাবলাম আমি ঠিক স্থানেই এসেছি। পালাব বলেই ভেতর থেকে চাবি দেবার বন্দোবস্ত, কিন্তু তারা জানে না, আমাদের পালাবারও ক্ষমতা চলে গেছে। আমরা দাঁড়িয়ে মার খাই, কথামত কাজ করি অথচ মুখে বলি আমরা বিদ্রোহ করছি। চীন দেশে দেখেছি, বিদ্রোহীরা হয় গুলির আঘাতে মরে নয় গুলির আঘাতে মারে। আমেরিকাতেও এই একই রীতি। সামান্য ছেঁচড়া চোরটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পদাঘাত সহ্য করে না, সে মারে নয় মরে।

বিছানা কি ভাবে করছে তা দেখতে লাগলাম। আঠার ফুট লম্বা তিন-খানা কম্বলের প্রত্যেকটাকে তিন ভাঁজ করে বিছানোর পর একখানা মোটা সাদা ধব্‌ধবে চাদর বিছিয়ে দেওয়া হল। সেটা হল নীচে দেবার। তারপর শুরু হল উপরের। উপরে দুটো বালিশ রেখে বিছানার আর একখানা মোটা সাদা চাদর বিছিয়ে আরও তিনখানা কম্বল রেখে বিছানা করা সমাপ্ত হল। ভাবলাম এরূপ বিছানায় স্বদেশে ক'দিন শুয়েছি? যে দেশে জেলের কয়েদীর ষ্টাণ্ডার্ডই এত উঁচু, সে দেশে সাধারণ লোকের ষ্টাণ্ডার্ড নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভাল হবে। কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জেল ভালই রাখে ভিতরটা কিন্তু একদম চুষে খায়।

বিছানা হয়ে যাবার পর বৃদ্ধ বলল, এখনই খানসামা আসবে, সে কিন্তু আমেরিকান্। এখানের নিয়ম হল, যে জাতের লোক এখানে আসে, সেই জাতের বাবুর্চি নিযুক্ত করা হয়। আপনার দেশের অনেক লোক বেকার আছে, আপনার দৌলতে একজনের কয়েক দিনের জন্য চাকুরী হবে মনে রাখবেন। একথা আমি বলেছি বলে কারুর কাছে বলবেন না।

আমি গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নাড়লাম।

যাবার বেলা বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, আমি ভারতের কোন্ প্রদেশ হতে এসেছি?

আমি বাংলা দেশ থেকে এসেছি, তাকে বললাম।

আমার কথা শুনে লোকটি চটপট আমার কাছ থেকে চলে গেল।

বাংলাদেশে তখন টেরারিজম্ চলছিল। আমেরিকার সংবাদপত্র তাই একটু বাড়িয়ে লোকের কাছে ধরত। কেনেডার লোক ভেবেছিল, বাংলা দেশ দ্বিতীয় আয়ারল্যাণ্ডে পরিণত হচ্ছে। এখানকার লোক অনেকেই আইরিশদের ঘৃণা করত কারণ এদিকের বাসিন্দা প্রায়ই ইংলিস, স্কট এবং ওয়াল্স।

পাঁচ মিনিট পরেই ইমিগ্রেসন অফিসার এসে ঘরের দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বাংগালী ?

হাঁ, একরূপই।

একরূপই কেন ?

এটা আমেরিকা, এখানে নিজেকে আমি বাংগালী বলে যদি পরিচয় দিই তবে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে, এখানে আমি হিন্দু (ইণ্ডিয়ান) বলে পরিচয় দেব।

তবে সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে ভাল করেই জানেন ?

নিশ্চয়ই।

আপনার জন্তে হিন্দু পাচক পাঠাব কি ?

হিন্দু পাচক পেলে ভালই হয়।

হিন্দু পাচক যদি না পাই এবং তার পরিবর্তে যদি একজন আইরিশম্যান পাঠিয়ে দিই তবে আপনার কোন আপত্তি থাকতে পারে না বলেই আমার মনে হয়। আইরিশরাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে যেতে চাচ্ছে। যেখানে উভয় জাতের মনের ভাব একরূপ সেখানে আইরিশ পাচক নিযুক্তিতে কি আপত্তি থাকতে পারে ?

হিন্দু পাচক না পেলে আইরিশ পাচক পাঠাবেন।

ইমিগ্রেসন অফিসার মুখ ভার ক'রে রুম পরিত্যাগ করলেন। আমিও বিরক্তিভরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার শরীর অবসাদে নেতিয়ে পড়ছিল। এত কষ্ট করে কেনেডায় এসেছি, কোথায় কেনেডা ভ্রমণ করব, তা না হয়ে আমাকে কেনেডাতে প্রবেশ করতেই দিলে না আমি ইউনাইটেড্ স্টেটে যাইনি কারণ তথাকার ইমিগ্রেসন আইন নাকি কেনেডা হতেও ভীষণ কড়াকড়ি। ভাবছিলাম ভারতও বৃটিশেরই, কেনাডাও তাদের কিন্তু ভারত যে বৃটিশের খাসমহল এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমিদারী তা আমার জানা ছিল না। জানা ছিল না অনেক কথাই, কিন্তু এ যে মস্ত কথা, এ কথাটা যাঁরা আজো জানেন না, তাঁদের আমি কোনমতেই শিক্ষিত বলতে পারি না।

দেশের কথা বার বার মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা। আই-সি-এস্ যাঁরা পাশ করে এসেছেন, তাঁরা এদেশে এসে সাহিত্যিক হন, কত বড় বড় কথা প্রচার করে লোক সমাজে আদরণীয় হন। কিন্তু এসব কথা যদি তাঁরা জেনে এসে ভারতে প্রচার করতেন তবে বোধ হয় আমাদের মত সাধারন লোককে এমন ভাবে ঠকতে হ'ত না। কিন্তু তা তাঁরা করেন না। তাঁরা লণ্ডনের উপর কুয়াশা দেখে সেই মুখখানির ঘোমটার কথা ভাবেন আর লোকে বাহবা দেয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আইরিশ পাচক এসে দরজা খুলে অভিবাদন করে বলল, "মশাই আমি হিন্দু খানা পাক করতে পারি। দয়া করে বলুন কি পাক করে আনব।" আমি বললাম, "এখন চা সিগারেট এনে দাও এবং যদি পার ত একখানা সংবাদপত্রও এনো। তারপর খাবারের কথা বলব। সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গিয়ে একটা চায়ের পট ভর্ত্তি করে চা মাখন রুটি এনে দিল। তার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সুখীই হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট এবং সান্ধ্য সংবাদপত্রও এনেছিল। এসব টেবিলে রাখবার পর

বললাম, এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই ডিনারের জন্ত নিয়ে এস, বিদায়। এখানে বিদায় শব্দের অন্ত অর্থ হয়, অর্থাৎ আমাকে আর বকিও না ; আমি সংবাদপত্রে মন দেব। লোকটি তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

চা খাওয়া সমাপ্ত করে আমি সংবাদপত্রে মন দিলাম। সংবাদপত্রে আমার মন এত নিবদ্ধ হয়েছিল যে বা'র হতে দরজা খোলার শব্দও আমার কানে পৌঁছোয়নি। দরজা খুলে মিঃ ইস্কি তাঁর দু জন বন্ধু এবং মিঃ চেন্‌কে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, মিঃ বিশ্বাস, চেন্‌কে এরা ধরে ফেলেছে। আমি বললাম, ইউনাইটেড ষ্টেটে তাঁকে কেউ বাধা দেবে না এ কথা নিশ্চয়ই। ভেংকোভার পোর্টে যাতে মিঃ চেন্ না নামেন তারই ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেজন্তই এখানে এনে তাকে আবদ্ধ করেছে। পোর্ট হতে জাহাজ ছাড়বার সময় তাঁকে নিয়ে যাবে। আপনারা চিকাগো চলে যান, হয়ত তিনি সিয়েটেল গিয়েই নামবেন।" এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হল, অনেক আইন চর্চ্চা করা হল। তারপর মিঃ ইস্কি বললেন, আপনি বোধ হয় ইউনাইটেড ষ্টেটে এবার যেতে পারবেন না। আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হয়।" তারপর মিঃ ইস্কি এবং তার তিন জন সাথী আমাদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে বাইরে গেলেন। আমরা নতুন উদ্যমে আমাদের কথায় মন দিলাম।

মিঃ চেনের বয়স বাইশ তেইশ হবে। তিনি আমেরিকাতে জন্মেছেন এবং তথায়ই শিক্ষা পেয়েছেন। তিনি দেশে গিয়েছিলেন, কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান পেয়ে, কিন্তু কাজ কিছুই করতে সক্ষম হন নি। চীনে নিয়ম রয়েছে আমেরিকার প্রজা যেই হোক না কেন, তাকে জেলে দেবার পূর্বে আমেরিকার কনসালকে জানাতে হবে। জেনারেল চিয়াং-কাই-সেক মিঃ চেনের আগমন জানতে পেরেই তাঁকে ধরবার জন্তে আয়োজন করেন। মিঃ চেন তা জানতে পারেন। জেনে শুনেও তিনি কিয়াংসী প্রদেশে মাও সুতন্ এর দলে যোগ

দিয়ে কাজ করতে সুরু করেন। কিন্তু আমেরিকান্ মনোভাবই হয়েছিল তাঁর শত্রু। অনেক চীনা গোয়েন্দা তাঁকে ভুলিয়ে মাও সুতন্ হতে অনেক দূরে টেনে নিয়ে পাকড়াও করার চেষ্টা করে, কিন্তু চেন্ সাহসী এবং শক্তিশালী লোক। তিনি অনেক গোয়েন্দাকে স্বর্গধামে পাঠিয়ে ছদ্মবেশে ফিলিপাইন দ্বীপে চলে যান, এবং তথা হতে টিকিট কেটে জাপানে আসেন। জাপান থেকেই তিনি জাহাজে উঠেন। মিঃ চেন্ দুঃখ করে বললেন, আইন কানুন অন্য সকলের জন্যেই ঠিক আছে কিন্তু কমিউনিষ্ট দমন করতে শত্রু-মিত্র সবাই সমান। এখন ইউনাইটেড ষ্টেট সরকার আমেরিকায় যেতে বাধা না জন্মালেই রক্ষা। লক্ষ্য করেছিলাম, অধিক রাত্রেও মিঃ চেন্ ঘুমাতে পারেননি। চীন দেশে আমেরিকান সরকার মিঃ চেনকে কোনরূপ সাহায্য করেননি, বরং যাতে তিনি চিয়াং-কাই-সেক কর্তৃক ধৃত হন তার বন্দোবস্তে সহায়তা করেছিলেন।

সাতটার সময় আইরিশ পাচক আমার জন্য খাবার নিয়ে এল। তিন রকমের ছয় স্লাইস রুটি, কয়েক টুকরা সিদ্ধ ভেড়ার মাংস, তিন খানা আমলেট, আলুভাজা, কপি সিদ্ধ, গরম দুধ এবং প্রচুর চা। মাখনও বোধ হয় আধ পোয়া হবে। আমাকে খাবার দিয়েই আইরিশ পাচক চলে যেতে চেয়েছিল। আমি বললাম, এ সব টেবিল হতে সরিয়ে রেখে যেতে হবে, খাবার পর আমি কিছু লিখব ভাবছি। তার কিন্তু দাঁড়াবার আদেশ ছিল না। তাই এক ঘণ্টা পরে সে আসবে জানিয়ে চলে গেল।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে, আবার আমরা কথাতে মন দিলাম। মিঃ চেন্এর সংগে জাহাজেই আমার পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি ভাল করেই জেনেছিলেন আমি কোন পথে চীন ভ্রমণ করেছি, সেইজন্যই তিনি মন খুলে কথা বলতে পেরেছিলেন।

দুদিন পর মিঃ চেন্ চলে গেলেন। ক্রমে আমি একাকী। একলা

থাকাই অনেকে পছন্দ করেন আবার আমার মত লোক তা মোটেই পছন্দ করে না। পড়বার জন্য অনেকগুলি সংবাদপত্র ছিল, তাই পড়তে লাগলাম। সংবাদপত্র পাঠ করে যখন আর ভাল লাগত না, তখন ভাবতে লাগলাম কি করে সময় কাটানো যায়। হঠাৎ মনে হল বিড়াল-চরিত্রের কথা। শীতের সময় বিড়াল চুপ করে শুয়ে থাকে। রুমে বেশ উত্তাপ ছিল। সেজন্য সবগুলি খিড়কী দরজা খুলে দিলাম। পনর মিনিটের মাঝে রুমটার উত্তাপ ফ্রিজিং পয়েণ্টে নেমে আসল। আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। এতে সময় কাটতে লাগল বেশ আরামেই।

এখানে আমার আসার সংবাদ কেউ জানত না। এন্. ওয়াই. কে. কোম্পানির লোকেরই জানার কথা ছিল। এন্. ওয়াই. কে. কোম্পানি হতেই বোধ হয় স্থানীয় এশিয়াটিক এসোসিয়েসনের সম্পাদক আমার আসার সংবাদ পেয়েছিলেন। যা হউক, যে কোন ভাবে তিনি আমার আসার সংবাদ পেয়ে দেখা করতে আসেন। হঠাৎ দরজাটা খুলে যাওয়ায় ভাবলাম হয়ত বয় এসেছে। চোখ খুলে দেখলাম একজন গম্ভীর প্রকৃতির জাপানী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেমন আমাকে নমস্কার জানালেন আমিও তেমনি তাঁকে নমস্কার জানালাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই তাঁর পরিচয় আমাকে দিলেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে খুসী হয়েছিলাম এবং আরও যখন শুনলাম তিনি আমাকে সকল রকমে সাহায্য করবেন তখন আরও খুসী হলাম। হাসিমুখেই বললাম আপনাদের অসীম দয়া, সাহায্য করে বাধিত করবেন। তিনিও হাসিমুখেই দুটি কথা বলেই বিদায় নিলেন।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম এ আবার কিরূপ সমিতি। এশিয়াবাসীর জন্য ? সিংহের মেষ শাবকে প্রেম, বৃটিশের ভারত প্রেম, ফরাসীদের ইন্দোচীনে প্রেম, জাপানীদের কোরিয়া প্রেম, আমেরিকার ফিলিপাইন প্রেম, ইটালীর ত্রিপলী প্রেম, কিন্তু এই এ্যসোসিয়েসন কোন জাতীয়

প্রেমের প্রতীক? স্বচক্ষে দেখে এসেছি জাপানীদের চীনা প্রেম, এটা কি তার চেয়েও বড়? এশিয়াটিক এ্যাসোসিয়েসন, যত বাজে কথা। লোক ঠকাবার ফন্দিমাত্র। ফিউডেলিজম আর নাই। এখন যারা ফিউডেলিজমের ফাঁদে পড়বে তারাই মরবে।

পরের দিন সকাল বেলা নতুন কয়েদী একটিও আসল না। আইরিশ বয়টি কথা বলার মতলবেই বোধহয় বার বার এটা ওটা নানান জিনিস নিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু সে কোন কথাই বলল না তবে বুঝলাম সামনে কোন বিপদ আসছে। এই কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই সে বার বার আসছিল। লক্-আপ এর দারোয়ান তাকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয় নি।

সকাল কেটেছে, দুপুর শেষ হয়েছে, বিকাল প্রায় সমাগত। বয় আসবে এবং তাকে ইংগিতে জিজ্ঞাসা করব কেন সে সকালে বার বার আসছিল, এটা মনে করেই সময় কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। যে লোকটি রুমে প্রবেশ করল সে একজন সুন্দর যুবা পুরুষ। তার পোষাক এবং চালচলন সাধারণ লোকের মত নয়। তার বুক পকেটে গোলাপ ফুলের বদলে গাঁদা ফুল গোজা ছিল। গলার কলারটা বেশ মোটা এবং উঁচু। ঘরে প্রবেশ করেই লোকটী আমাকে বেশ নম্রভাবে নমস্কার করল। আমিও তাকে আপন জনার মতই বেঞ্চে বসতে বলে বিছানা হতে উঠে এসে তার কাছে বসলাম। আমাকে তার কাছে বসতে দেখে সে যেন একটু ঘৃণা বোধ করল। আমি তা বুঝতে পেরে তাকে বল্লাম, "কেন এত ঘৃণা করছেন? আমিও আপনার মতই মানুষ, তবে রংটা একটু কালো। আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন বলে আমি মোটেই দুঃখিত নই। কারণ আপনার জাতের কেউ আজ পর্যন্ত আমার বাড়িতে গিয়ে সমপর্যায়ে বসতে পারে নি। যে রাজকীয় 'সিম্বল' নিয়ে আপনারা এত বাহাদুরী করেন

সেই রাজাও আমার কাছে অপবিত্র ম্লেচ্ছ, এক সংগে বসে খাবার অনুপযুক্ত। ঘৃণা করে ভালই করেছেন, বদল নিয়েছেন মাত্র। দয়া করে যখন এসেছেন তখন বৃথা সময়ক্ষেপ না করে পরিচয় এবং আগমনের কারণটা জানিয়ে বাধিত করুন।

আগন্তুক পরিচয় দিল সে জাপানী জাহাজ কোম্পানীর এজেণ্ট। আমি তাকে বললাম, "ভালই হয়েছে, এবার আমাকে জাপানী কন্সালের কাছে নিয়ে চলুন, জাপান ফিরে যাবার "ভিসা" নিয়ে আসতে হবে।" লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনি চীনের 'ভিসা' নিন। চীনা কমিউনিষ্টরা আপনাকে বেশ সাহায্য করেছে, জাপানে গিয়ে আর কি লাভ হবে? জাপান আপনি বেশ ভাল করেই দেখেছেন। জাপানে কমিউনিষ্ট নাই সে কথা বোধ হয় জানেন।" এ সম্বন্ধে কথা বাড়ালাম না, কারণ জাপানেও মিকাডোদ্রোহী লোক আছে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম এবং তাদের প্রতি অত্যাচার বেশ ভাল করেই করা হয়। আমি শুধু ভিসার কথা বলতে লাগলাম। কথা অনেকক্ষণ চলল, এতে লোকটার খাঁটি পরিচয় পেতে কষ্ট হল না।

প্রাচ্যদেশে ইন্টার-ন্যাশনেল গোয়েন্দার কয়েকটা মাত্র আড্ডা আছে। তার মাঝে সিংগাপুর, সাংহাই, পিকিন্ এবং জাপানের কোবীর নাম করা যায়। শুনছিলাম ভারতেও নাকি সেরূপ একটা আড্ডা আছে তবে তার হেড-কোয়ার্টার কোথায় জানবার জন্য মাথা ঘামাই নি। এই ইনটার ন্যাশনেল গোয়েন্দাদের চীনা, ফিলিপাইনো, কোরিয়ান্ এবং ভারতীয় রাজ-দ্রোহীদের প্রতি খর-দৃষ্টি রাখার জন্যই নাকি গড়া হয়েছিল এবং এই মস্ত বড় গোয়েন্দাদের খরচ জাপান, আমেরিকা, বৃটেন এবং হল্যাণ্ড বহন করত। কেনেডায় ভারতীয়দের একটা গদর পার্টি ছিল। তাদের সংবাদ নেবার জন্যও একজন বুদ্ধিমান লোকের দরকার হয়। কেনেডা সরকার কোন

ভারতীয়কে সে কাজে নিযুক্ত না করে একজন কেনেডিয়ানকেই সে কাজে নিযুক্ত করেন। নবাগত সুন্দর ভদ্রলোকটী হলেন সেই ইন্টার-ন্যাশনেল গোয়েন্দা।

এজেন্ট মহাশয় যে ভাবে কথা আরম্ভ করলেন তাতে মনে হ'ল না তিনি জাপানীদের চাকর। তিনি বাংলা দেশের সংবাদ বেশ রাখতেন এবং বাংলাদেশের সিভিসনের তার যে অভিজ্ঞতা ছিল, আমার কিন্তু তার শতাংশের এক অংশও ছিল না। এমন কি এ বিষয় নিয়ে আমি কোন দিন চিন্তাও করিনি। কথা প্রসংগে যখন জবাব দিতে লাগলাম তখন ভাণ করতে লাগলাম যেন আমি সবই জানি। এরূপ ভাণ করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম কারণ স্বদেশ সম্বন্ধে যদি কিছু সংবাদ না রাখি এবং বিদেশের সংবাদই যদি শুধু সংগ্রহ করি তবে এ পৃথিবী ভ্রমণের কোন মূল্য থাকে না।

কথা প্রসংগে যখন লোকটী চীনের কমিউনিষ্টদের সংগে ভারতের কয়েক-জন বিপ্লবীর তুলনা করল এবং বেংগল ও হুনান প্রদেশের মত হতে চলেছে বলল, তখন বাস্তবিকই আমার বিস্ময় হয়েছিল। তারপর সে বলতে লাগল ভারতের বৃটিশ শাসনের মাহাত্ম্য। লোকটা এমন ইংগিত ও করল যাতে করে বুঝতে পেরেছিলাম এই হুনান প্রদেশের গণ্ডগোলের জন্য হয়ত একদিন জাপান সোভিয়েট রুশ আক্রমণ করবে। জাপান ১৯৩৫ সালে বাহির মংগোলিয়া আক্রমণ করেও ছিল কিন্তু এতে জাপানই হেরেছিল।

ভারতে বৃটিশ শাসন, অনার্য আমলে আর্যের শাসন, হিন্দুর আমলে মুসলমানের শাসন এসব কথা নিয়ে যখন প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল তখন এ লোকটা যে গোয়েন্দা তাতে আর সন্দেহ রইল না। অন্য যে কোন লোক জেল কয়েদীর সংগে আধ ঘণ্টার বেশি কথা বলতে পারে না কিন্তু তিনি ঘণ্টারও বেশি ছিলেন।

বয় চা নিয়ে এল। আমি তাকে চা খেতে বললাম কিন্তু সে চা খেল

না। আমি তাতে মোটেই দুঃখিত হই নি। অবশেষে সে আমার মুখ থেকে এই বের করতে চেয়েছিল যে বৃটিশ শাসনে আমরা বেশ উপকৃত হয়েছি। আমি এক কথায় বললাম, "বৃটিশ শাসনের দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় নি। ঐ যে দেখছেন রেল লাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, হসপিটাল, জলের কল, স্কুল কলেজ, বড় বড় পথ এসব বৃটীশ করেছে বৃটীশের স্বার্থ বজায় রাখতে। এতে কতকগুলি ভারতবাসী সত্যিই উপকৃত হয়েছে বটে কিন্তু এই উপকৃত ভারতবাসীরা হ'ল ভারতের ইনটেলিজেনসিয়া। এদেরে যদি উপবাসী রাখা হয় তবে এরা আরও কত সেপাই-বিদ্রোহের সৃষ্টি করত তার কথাও চিন্তা করা দরকার। আপনি যেমন বুদ্ধিমানই হউন না কেন সব দিকের সকল সংবাদ আপনি রাখেন না বলেই ভারতে বৃটীশ শাসনের গুণ গাইছেন। আর একটা কথা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। আপনি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন আমি একজন বিপ্লবী কি না ; এতে আমি অনেকটা আরাম পেয়েছি। লোকালয়ে চুপ করে বসে থাকাটা আমার অভ্যাস নাই, কিন্তু এত বড শহরে এসে আমাকে চুপ করে সময় কাটাতে হচ্ছে। আপনি এসে আমার কষ্টের অনেক লাঘব করেছেন এ যেমন সত্যকথা, তেমনি আমাকে বিপদে ফেলবারও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে আপনাকে যদি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দেই তবে আমি একটা গাধা ছাড়া আর কি হতে পারি ? বলুন সত্য কি না।" লোকটা আর কথা বলল না দেখে ফের জাপান যাবার ভিসার জন্য চেষ্টা করব কি না জিজ্ঞাসা করলাম। সে কথার উত্তর না দিয়েই লোকটা অভদ্রভাবে চলে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলাম একস্থানে লেখা রয়েছে, ইছামত উল্লা, জিলা শ্রীহট্ট, ভারতবর্ষ—আমি মানুষের বাচ্চা নই, আমি কুত্তা, আমার দেশে মানুষ নাই সবই কুত্তা, মানুষ হইলে আমাকে ভাগাইয়া দিতে পারিত না, ইয়া আল্লা খোদা-উন করিম।" আর এক

স্থানে দেখলাম একটা সংখ্যার লহর। তারপর চীনা, জাপানী, ইংলিশ, স্পেনিস, গ্রিক, আরবী, পারসী, হিন্দি, গুরুমুখী, গুজরাতী, মারহাট্টি, আরো কত ভাষায় কত কি যে লিপিবদ্ধ আছে তার হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কত লোকের দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাস এই ঘরটাতে রয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কত লোকের দীর্ঘ নিশ্বাস বইবে তার ইয়ত্তা নাই। এ ঘরে দীর্ঘ নিশ্বাসের সংখ্যা বাড়বেই। পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত ফেনাটিক দেশাত্মবোধের জাতীয়তাবাদ যতদিন জীবিত থাকবে ততদিনই এ ঘরে দীর্ঘ নিশ্বাসের সংখ্যা বাড়বে। দেশাত্মবোধ বেশ ভাল কিন্তু পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে লোক যদি চলে তবে দীর্ঘনিশ্বাস, রক্তগঙ্গা ব্যভিচার চলবেই।

আবার সেই সন্ধ্যা বেলা। আর একটি অভাগাকে ক্যানেডিয়ান ইমিগ্রেসন বিভাগ টেনে নিয়ে এসেছে। সে তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলে। তার মুখে এখনও যৌবন এসে দেখা দেয় নি। ছেলেটি জাতে জাপানী। সে জাপানী হউক আর যেই হউক, এখনও তার মাঝে ছেলেমানুষী রয়েছে। তারপর সে কৃষক। কৃষকের সরল বুদ্ধি তার মুখে ফুটে রয়েছে। তার দেশের সাম্রাজ্যবাদকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু সে আমার ঘৃণার পাত্র নয়! অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলের বাবা এসে হাজির হ'ল। ছেলের বাবা ছেলেকে পেয়ে বুকের মাঝে টেনে এনে অনেক কথা বলল। তারপর আমাকে ঘরে দেখে পিতা পুত্র উভয়ে মিলে নমস্কার করল। আমি ইন্দোচীন। আমার প্রতি তখনও তাদের অর্থাৎ মামুলী কৃষকদের শ্রদ্ধা ছিল। এটা থাকা স্বাভাবিক। যতক্ষণ ধর্ম্মের গোলামী মানব হৃদয়ে বিরাজ করবে ততক্ষণ মথা নত করবার প্রবৃত্তিও থাকবে।

তারপর সপ্তাহ খানেক কেটে গেল, দুবেলা শুধু—বয়টির মুখ দেখেই তৃপ্ত হতে হ'ত। বয়ও কথা বলত না আমিও তাকে বলাতে চেষ্টা করতাম

না পাছে তার কোন বিপদ আসে। একদিন বিকাল বেলা হঠাৎ দরজটা অসময়ে খুলে গেল। আমি ভাবছিলাম হয়ত পুলিশের লোক। ওয়ার্ডেন একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তা নয়; ভদ্রলোকের কপাল এবং মুখের আকৃতি একদম উত্তর দেশীয় অর্থাৎ নরডিক তবে চোখের তারা এবং চুল গভীর কালো।

তিনি বিবাহিত। অসৎ লোকের সংগে থাকা তাঁর ভাল লাগে না বলেই আমার রুমে তাঁকে আনা হয়েছে। অনেক দিন নির্জন কারাবাস করেছি, এখন লোকসংগ আমার কাছে বড়ই আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছিল। তিনি প্রবেশ করে আপন জনের মত আমার কাছে বসলেন। ওয়ার্ডেন আমাদের লক্ আপ করে চলে গেল। আমরা অনবরত কথা বলতে লাগলাম। যখন বাজে কথা বলতে ভাল লাগল না তখন সুরু হল আসল কথা।

ভদ্রলোক বললেন যখন তিনি কচি ছেলে ছিলেন তখন তাঁর মা বাবা ইউনাইটেড্ স্টেটে আসেন এবং সেইখানেই লেখাপড়া শিখেন। স্টেটের ভাষায় এই কথাটাকে বলা হয় "Raised up." যৌবনে পদার্পণ করে স্টেটেই অনেকদিন মজুরী করে কিছু অর্থ সন্চয় করে ভদ্রলোক গোপনে কেনেডায় আয়েন এবং একজন ইণ্ডিয়ান রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়ান রমণীর জমিতে স্বর্ণখনি ছিল একথা তিনি জানতেন। বিবাহের পরই স্বর্ণখনির খোঁজে বের হয়ে একটা বেশ ফলপ্রদ খনি বের করে কাজের লাইসেন্স নেন। কাজ যখন শুরু করলেন তখন তাঁর মনে দেশী ভাইদের কথা আপনি জেগে উঠল। এ অন্চলে অনেক ইটালিয়ানো বসবাস করত। তিনি জাতে ইতালিয়ানো ছিলেন সেজন্য দেশীভাইদের অন্বেষণ বেশি করতে হ'ল না। কয়েক দিনের মাঝেই কতকগুলি ইটালিয়ানো মজুর তার স্বর্ণ-খনিতে নিযুক্ত হল। ইটালিয়ানোদের আকৃতি এবং প্রকৃতি অনেকটা পান্জাবীদের মতই। যে সকল পান্জাবী দাড়িগোঁফ কেটে কেনেডায় অথবা স্টেটে

বাস করছে অনেকেই তাদের ইটালিয়ানোই ভাবে। দু একজন হিন্দু অর্থাৎ পানজাবী মুসলমান তার স্বর্ণখনিতে কাজে যোগদান করল। কাজ বেশ ভালমতেই চলতে লাগল। কতদিন কাজ চালাবার পর ভদ্রলোক দেখলেন কতকগুলি ইটালিয়ানো খনি হতে গোপনে সোনা উঠিয়ে অন্যত্র নিয়ে বিক্রয় করছে। এতে তাঁর ভয়ানক রাগ হল এবং কয়েকজন মজুরকে কর্মচ্যুত করলেন। যে কয়েকজন মজুর কর্মচ্যুত হয়েছিল, তারা স্বর্ণখনির কাজ ফিরে পাবার জন্ম মোটেই উৎসাহ দেখাল না কিন্তু তারা খনি ছেড়েও গেল না। দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে ইটালিয়ানো ভদ্রলোককে ধরে ফেলল এবং জানাল, এ অনুদেশে বিয়ে করে কেউ নাগরিক হতে পারে না, নাগরিক হতে হলে কেনেডাতে জন্ম নিতে হয় অথবা ইউরোপ হতে সরাসরি এসে বসবাস করতে হয়। এদিকে তাঁর কাছে এমন কিছু কাগজ ছিল না যাতে করে তিনি স্টেটের প্রজা বলে পরিচয় দিতে পারেন। ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। বাধ্য হয়েই তাঁকে ইমিগ্রেসন অফিসের জেলখানাতে আসতে হল।

দু ডলার সংগে করে নিয়ে একটি ইউরোপীয়ান কেনেডায় প্রবেশ করতে পারে। ইউরোপীয় মজুরদের কেনেডায় অবাধ প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু ইউরোপীয় ছোট খাট ধনীকে সেরূপ সুযোগ দেওয়া হয় না। এখানে শুরু হয় পুঁজিবাদীতে ঝগড়া অথবা কম্পিটিসন। যাতে করে পুঁজিবাদীদের সংখ্যা না বাড়ে এই হল গোড়ার কথা।

ইটালীয়ানো ভদ্রলোক জেলে আসার পরই লোক সমাগম শুরু হল। তাঁর ইণ্ডিয়ান স্ত্রী প্রত্যেকদিন আসতে লাগলেন এবং আমার সংগে কথা বলে সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন কয়েকজন ইটালীয়ানোই তাঁর স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছে। জাতিশত্রুতা ইটালীয়ানদের মাঝেও বেশ আছে, সেজন্যই বৃটিশ, জার্মান, ফ্রেন্চ, স্কেণ্ডিনেভিয়ান,

হোয়াইট রাশিয়ান, পোলিশ, এই কয়টি জাত ইটালিয়ানদের এখনও ইউরো পীয় বলে স্বীকার করে না। ইটালিয়ানরা উল্লিখিত জাতগুলির কাছে 'নেটীভ' অথবা ইটালীয়ানো বলে পরিচিত।

কয়েকদিন যাবার পর ইটালীয়ানো ভদ্রলোক তাঁর পিতামাতা এবং বড় ভাইএর কাছে তার করলেন। তারের জবাব এল—যখন জেল হতে মুক্ত হবে তখন দেশে চলে এস।" এতে ভদ্রলোকের ভালই হয়েছিল। তাঁকে তাঁর দেশে অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটের কোথাও পাঠানো হয়েছিল। কেনেডার ইমিগ্রেসন বিভাগ সাদা জাতের জন্য আইনের অর্থ অন্য রকমে করেন। কয়েকদিনের মাঝেই ভদ্রলোক চলে গেলেন বটে কিন্তু তিনি কেনেডার প্রগতিশীল সমাজে আমার পরিচয়ের সুযোগ এবং সুবিধা করে দিলেন।

নানারকমের লোক নানারূপ বাহানা করে আমার কাছে আসতে লাগল; ইমিগ্রেসন বিভাগ আমাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়লেন। আমার মনে হয়, যাঁরা আমার কাছে আসতেন তাঁরা প্রায়ই কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন। কমিউনিষ্টদের কয়েকখানা সংবাদপত্রও আমাকে মাঝে মাঝে দেওয়া হ'ত। দুঃখের বিষয় এখানেও ত্রসকাইত এবং ষ্টালিনপন্থী বলে দুটি দলের অস্তিত্ব অনুভব করলাম। আমি এই দলাদলি নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতাম না, শুধু বলতাম কেনেডাকে সোভিয়েটাইজড্ কর, দেখবে দলাদলি আপনি চলে যাবে। যারা কাজ করে না তারাই দল পাকায়, তারাই বেশী কথা বলে, তারাই কষ্টের সময় দাঁড়াতে পারে না, দল ছেড়ে পালায়।

কথা বলতে সময় পাওয়া যেত মাত্র আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টার মাঝে কোন বিষয় নিয়ে চর্চা করে তার সমাধান করতে পারতাম না, তাই অনেকে দুবার আসতে বাধ্য হতেন।

একদিন রবিবারে হঠাৎ এক ভারতীয় পাদরী এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁর দেশ পান্ যাবে। তিনি একজন ইউরোপীয় পাদরীর সংগে কাজ করতেন। সেই ইউরোপীয় পাদরীও ভারতে ছাব্বিশ বৎসর ছিলেন। ভারতীয় পাদরী এসে আমার শহর দেখার বন্দোবস্ত করলেন, ইউরোপীয় পাদরী এসে আমাকে শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমি জেল হতে বের হয়ে ভাবলাম এইত স্বর্গ, আমরা স্বর্গ স্বর্গ বলে অনর্থক চীৎকার করি। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা শহর প্রদক্ষিণ করে একটি চীনা ক্লাবে গেলাম। তথায় চীনারা আমাকে আদর আপ্যায়ন করলেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমূহ নিন্দা করলেন। তারপর আমরা যাই জাপানী ক্লাবে। তথায়ও আমরা সমাদৃত হই কিন্তু তথায় শুধু বৃটিশ বিদ্বেষের কথাই শুনেছিলাম। তাদের এই বিদ্বেষ প্রকাশে আমিও সায় দিয়েছিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদে প্রভেদ কোথায়, আমি ত খুঁজে পাচ্ছি না। জাপানীরাও কোরিয়া, ফরমোজা এবং উত্তর চীন পদানত করে রেখেছে, বৃটিশও তেমনি ভারত কেন পৃথিবীর অনেক দেশই পদানত করে রেখেছে। জাপানের বৃটিশ বিদ্বেষ বৃটিশের সমান হবার জন্য, এ কথাটা আমি ভাল করেই জানতাম। তানাকা মেমোরিয়াল ত মামুলী কথা, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবী গ্রাস করতে চায়, তাও আমি জাপানে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। বৃটিশ দুনিয়া গিলে বসে আছে, জাপানী চায় বৃটিশের পেটের ভেতর থেকে কিছু বের করে ফের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মতই গিলে বসতে। এসব নকল প্রেমে যারা পা বাড়ায় তারা কষ্ট পায়। একজনের পেট থেকে বের হয়ে নতুন করে অন্যের পেটে যাওয়াটা হল প্রথম কষ্ট, দ্বিতীয় হল নতুন পেটের ভেতরে কত প্রখর জঠরাগ্নি আছে তাও ত জানা নেই। ওসব কথা নতুন করে আজ আমি বলছি না, যেদিন মানচুরিয়া দেখেছিলাম সেদিনই ডাইরিতে লিখেছিলাম।

জাপানী এসোসিয়েশনের বাড়ী হতে বের হবার পর একজন সংবাদ-

পত্রের রিপোর্টার আমাকে;ভাংকোভার স্থান অফিসে ডেকে নিয়ে যান এবং আমার সম্বন্ধে একখানা প্রকাণ্ড রিপোর্ট লেখেন। সেই রিপোর্ট সেদিনই বিকাল বেলায় প্রকাশ হয়। স্থানীয় রক্ষণশীল পত্রও আমার রিপোর্ট ছাপিয়েছিলেন। রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের মধ্যে কত প্রভেদ তা এ দুটা রিপোর্ট দেখলেই বুঝা যাবে। এখন আমি রিপোর্ট দুটার নকল না দিয়ে সেদিনের অন্যান্য কথা প্রথম বলব, তারপর রিপোর্টের নকল দেব।

সংবাদপত্র অফিস্ হতে বের হয়ে আমরা ভারতীয় কলনীতে গেলাম। এখানে দক্ষিণ আফ্রিকার মত হিন্দুদের সিগ্রিগেট করা হয়নি। ভারতীয়দের বসতির মাঝে শ্বেতকায় কেনেডিয়ানরাও বসবাস করে। ঘরগুলি আবহাওয়া অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘর তৈরীর দিক দিয়ে ভারতীয় কৃষ্টির কোন গন্ধ ছিল না। থাকবার কথাও না। ঘরগুলি দেখে আমি সুখী হয়েছিলাম। পাদরী মহাশয় আমাকে ভারতীয় ঘরের উৎকৃষ্টতার কথাই বলছিলেন। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলাম। পাদরী আমাকে বলেছিলেন 'তবে আপনি ইউরোপীয় প্রথা মতেই বাড়িঘর প্রস্তুত করা পছন্দ করেন নিশ্চয়ই?' আমি তাঁকে বলেছিলাম, "ইউরোপীয় প্রথা মতে আমি কিছুই পছন্দ করি না। বৈজ্ঞানিক প্রথা মতে সকল কাজের যাতে উন্নতি হয়, আমি তাই চাই। ইউরোপীয় প্রথা বলতে কোন প্রথা আমার চোখে আজ পর্য্যন্ত পড়েনি, হয়ত পড়বেও না।" আমরা যখন এই কথা নিয়ে তর্ক করছিলাম তখন একদল বেকার মজুর আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কেনেডার বেকার মজুর নতুন কথা জানতে এবং শুনতে বড়ই ভালবাসে। আমরা পথে না দাঁড়িয়ে গুরুদ্বারের দিকে অগ্রসর হলাম।

শিখরা তাদের গুরুদ্বারে জমা হয়েছিল। প্রথম ধর্মচর্চা হল, তারপর শুরু হল আমার বিষয় নিয়ে আলাপ। এখানেও গদর পার্টি ছিল। গদরগণ আমাকে সাহায্য করতে রাজি হল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এদের

সাহায্যে হয় ত আমার আমেরিকা ভ্রমণ সম্ভব হবে। সেজন্য দাঁড়িয়ে একটা ছোট-খাট লেকচারও দিলাম। দুর্দিনে সভাস্থলেই প্রায় একশত ডলার জমা হল। টাকাটা তৎক্ষণাৎ আমার হাতে না দিয়ে যদি মুক্তি পাই তবে দেওয়া হবে তাই ঠিক হল। সভাতে আমাকে নিয়ে চারজন মাত্র হিন্দু ছিলাম। আর সাবাই ছিলেন 'বাংগালী।' কেনেডা সরকার শিখদের ব্যবহৃত "বাংগালী" শব্দ স্বীকার না করে হিন্দু শব্দই ব্যবহার করতেন। কেনেডার রক্ষণশীলরা কিন্তু ভারতবাসীদের রেড ইণ্ডিয়ানদের সমপর্য্যায়ে ফেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বলেই লেখত এবং এমন কি আমার সম্বন্ধে যা লিখেছে তাতেও সেই অসৎ মনো-ভাবের পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। সভাতে একজন মাত্র পাঠান ছিলেন, দুজন ছিলেন পান্‌জাবী খৃষ্টান আর ছিলাম আমি। কথায় কথায় একজন শিখ হঠাৎ বলে ফেলেছিল, "যখন কোন হিন্দু এদেশে এসে বিপদে পড়ে তখন হিন্দুরা মোটেই সাহায্য করে না, বাংগালীদের সকল রকমের বিপদের সামনে দাঁড়াতে হয়।" এতে পাঠানের বড়ই রাগ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমার দুখানা মটর লরী বিক্রি করে যে টাকা পাব তা দিয়ে মিঃ বিশ্বাসের জামিনের টাকাও হবে না আমি আর কি সাহায্য করতে পারি বলুন? বাংগালীদের অর্থাৎ শিখদের এখানে কাঠ কাটার মিল আছে, ইচ্ছা করলেই হাজার ডলার একজনই দিয়ে দিতে পারেন, হিন্দুদের সংখ্যাই মাত্র তিনজন, এ সময়ে আপনারা সাহায্য না করলে আর কে সাহায্য করতে পারে?

এদের তর্ক শুনে আমার হাসি পেয়েছিল। শিখরা কেনেডাতে গিয়ে বাংগালী বলে পরিচয় দিচ্ছে আর মুসলমান পাঠান এবং খৃষ্টানগণ নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছে! আমি ওদের কথা আর বাড়াতে দিলাম না। পরের দিন যা হয় কিছু করে যেন আমাকে সংবাদ দেওয়া হয় তাই বলে বিদায় নিলাম।

আমেরিকাতে একই সংবাদপত্রের অনেকগুলি সংস্করণ রোজই বের হয়। এসব সংস্করণকে 'এক্সট্রা' বলা হয়। আমার সংবাদ বহন করে 'ভেংকোভার' স্যানে এক্সট্রা বের হয়েছিল। তার অবিকল নকল দিয়ে দেওয়া গেল।

CYCLIST THWARTED

HINDU YOUTH WHEELS AROUND THE WORLD

Ramnath Biswas, a Hindu youth with ambitions to cycle around the world alone and make the trip pay for itself, may be disappointed and unhappy at what happend to him in Vancouver, but he is determined to keep on going, even if not in Canada or the United States.

Arriving in Vancouver on Sunday from Japan on the Heian-Maru, he ran into difficulties with immigration authorities of two countries.

CAN'T GET PERMIT

Neither Canada nor U.S.A. would let him proceed east or south on his bicycle, the official explanation being that he was unable to comply with immigration requirements and there was no assurance of his being able to continue his journey to some other land.

So Ramnath Biswas has decided to take ship to Panama and ride his wheel through Central and South America. Perhaps he may get back to Canada he says. This is his first trouble since he left home, he declares, and he has records to show that he has been through the Malaya peninsula, Siam, Indo-china, China, Manchuria, Koria, and Japan.

PLANNED TO CROSS CANADA

He claims to have been the first man to make the journey from Canton to Harbin by bicycle. He had planned to cross Canada and take boat to England. He left Singapore, where he was a clerk in the Marine court on July, 1931.

Claiming to have been born a British Subject—he does not quite understand why he is not allowed to cross Canada. Vancouver Hindus, he states, have endeavord to raise cash to post a bond guaranteeing that he would not remain in Canada but he has decided to go to Panama. Meantime he is a guest of the immigration department at the Detention Building.

World Cyclist To Miss. U. S.; Will Go To Panama

Dated 29-9-32

উপরের লিখিত বিবরটি আমার জেলে ফিরবার দু'ঘণ্টা পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইমিগ্রেসন সংবাদ পাঠ করে কি ভেবেছিলেন জানিনা, কিন্তু জেলে ফিরে আসার পরই দারোয়ান আমাকে এমন দুএকটা কথা বলেছিল যাতে করে

আমি বুঝতে পেরেছিলাম আর হতে আমার প্রতি একটু কড়া ব্যবহারই করা হবে। তবে সুখের বিষয় এর পরও আমাকে টেলিফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল এবং পরের দিন যখন আমি মিঃ বেনেটের কাছে দারোয়ানের অন্যায় আচরণের কথা বলেছিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে স্থানচ্যুত করেন। পরের দিন একখানা রক্ষণশীল সংবাদপত্র আমার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ বের করেছিল তার অনেকটাই অপ্রাসংগিক এবং কর্কশ। তবুও পাঠক পাঠিকার জ্ঞাতার্থে তারও অবিকল নকল দেওয়া গেল।

Ramnath Biswas, Cycling East Indian tourist will not visit the North American Continent on his present tour.

Refused admission to the U. S. A. by immigration authorities, he has decided to proceed directly to Panama as soon as a boat is available and will explore South America. He is being held by canadian Immagration authorities here pending his departure for Panama, but hopes to tour this country eventually. The youth has arrived here on S S Heian Maru about ten days ago.

এখানে আমি বলতে বাধ্য হব, ইচ্ছা করেই আমাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান ইণ্ডিয়ান, অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে বড়ই ঘৃণার কথা। আমেরিকানরা ইণ্ডিয়ান শব্দটা মোটেই ভালবাসে না। বদ মতলব অন্তরে পোষণ করে বলেই বোধহয় রক্ষণশীল সংবাদপত্র আমাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বলে লেখেছিল। শুধু তাই নয় আমি কেনাডাতে প্রায় ষোল দিন পূর্বে পৌঁছেছিলাম অথচ লেখা হল দশদিন পূর্বে এসেছি। পানামাতেও আমার যাওয়া হয়নি; কারণ পানামা ইউনাইটেড স্টেটের একটি কলনী যদি বলা বলা হয় তাতে দোষ হবেনা।

নূতন দারোয়ান জাতে স্কচ। তার পিতা ভারতবর্ষে অনেকদিন পল্টনে কাজ করার পর মাদ্রাজে বসবাস করেন। তার পুত্র যুবক প্যাট ইংলণ্ড হয়ে কেনেডাতে এসে সরকারী কাজ নেয়। এদেশে সরকারী কাজের মাইনে খুব কম একথা প্যাটের জানা ছিল না এবং সরকারী কাজে আনুসংগিক আরও অনেক কাজ করতে হয় তাও সে জানত না। যখন কাজে যোগ দিল তখন প্যাট বুঝতে পারল তার কাজের স্বরূপ কি? কাজের স্বরূপ জেনে শুনেও সে সরকারী কাজ পরিত্যাগ করল না। ভারতের সেই আরাম কিন্তু তার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছিল। দশটাকা মাইনের বাবুর্চি, পাঁচ টাকা মাইনের মেথর, সাতটাকা মাইনের বয় পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর ছোট বেলার সুখের কথা সে একদিনের তরেও ভুলতে সক্ষম হয়নি। আমাকে দেখা-মাত্র তার সেই সুখ স্বপ্নের স্মৃতি ফিরে এল, এবং আমাকে বার বার বলতে লাগল পেন্‌সন্ নেবার পরই সে ইণ্ডিয়াতে গিয়ে বাস করবে। সুখের বিষয় আমি কোন বর্ণের লোক সে তা আমাকে জিজ্ঞাসা করে নি, যদি জিজ্ঞাসা করত তবে আমি হরিজন বলেই পরিচয় দিতাম, কারণ হরিজন বলে পরিচয় দিলেও ভারতের দরিদ্র নারায়ণদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়, এই ছিল আমার ধারণা এবং এখনও আমি সেই ধারণাই পোষণ করি। যে পর্যন্ত ভারত স্বাধীন না হয় সে পর্যন্ত এই ধারণা পোষণ করা দরকার। জাপানী সামুরাইদের মত আমাদের দেশের জাত্যাভিমানীরা কখনও নিজেদের উপাধি পরিত্যাগ করতেও সাহস করবেনা, এটা আমি ভাল করেই জানি। চীন দেশে ভ্রমণ করবার সময় আমাকে বাধ্য হয়ে আমার সামাজিক স্তরের কথা বলতে হয়েছিল। আমার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে কমিউনিষ্টগণ মহা চিন্তিত হয়েছিলেন। বর্ণশ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছি, সামাজিক কর্তৃত্ব এবং নিরাপদায়ী আমার ব্যবসা, এমন

লোকের মাঝে কি করে কমিউনিজম প্রবেশ করান যায় তাই ছিল তাঁদের চিন্তনীয় বিষয়। আমি কিন্তু তাঁদের সেই গুরুতর বিষয়ের সমাধান করবার একটা উপায় বলে দিয়েছিলাম। বিষয়টি যদিও অবান্তর তবুও এখানে বলা দরকার মনে করি।

আমার নাম রামনাথ বিশ্বাস। রামনাথ শব্দটা সাধারণতঃ নীচ বর্ণের লোকের হয়ে থাকে। আমার উপাধি বিশ্বাস। বিশ্বাস উপাধিটা নমশূদ্র, মুসলমান এই দুই শ্রেণীর লোকের মাঝেই বেশী; নাম এবং উপাধির মণি-কাঞ্চন যোগে আমাকে নীচবর্ণের লোক বলেই সকলে ধারণা করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুর মাঝে বিশ্বাস উপাধি অতি অল্প লোকেরই আছে। আমি যখন ইণ্ডিয়ান মিলিটারী বিভাগে কাজ করতাম তখন একদিন এক চট্টোপাধ্যায় আমার বাড়িতে অতিথি হন। তিনি খাওয়া দাওয়া করে শোবার সময় পৃথক বিছানা দাবী করলেন। আমার কাছে পৃথক বিছানা ছিল না। বাধ্য হয়ে শীতের রাতে আমাকে মাটিতে শুতে হল, কারণ তিনি ছোট বর্ণের লোকের সংগে এক বিছানায় শুতে রাজি ছিলেন না। আমিও নীচবর্ণের লোক হবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। সারাটি রাত্র আগুনের কাছে মাটিতে শুয়ে থাকতে হল। পরের দিন বুঝলাম নীচবর্ণের লোক হওয়া কত কষ্টকর। শরীরে ব্যথা হল। জ্বর হয়ে নিমোনিয়া হবার সম্ভাবনা হল। অতি কষ্টে সেবার বেঁচে গেলাম। মনে রাখলাম উচ্চবর্ণের বদ্ খেয়ালীতে নীচ-বর্ণের অনেক লোকের অকাল মৃত্যু হয়। এরূপ বর্বরোচিত জাতিভেদ ভারতের বুকের ওপর তাণ্ডব নৃত্য করছে তার উচ্ছেদ করতে হবেই। ব্রাহ্মণের একমাত্র লক্ষণ কয়টি সুতা। সেদিনই আমি তা ছিঁড়ে ত ফেলে দিলামই এবং যখনই কোন তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোক আমার ঘরে প্রবেশ করতে চাইতেন তখনই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম তাঁর গলায় পৈতা আছে

কি না? যদি পৈতা নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতে চাইতেন তবে তাঁকে বলে দিতাম এখানে তোমার প্রবেশ নিষেধ। বর্বরতাকে বর্বরভাবেই অপসারণ করতে হয়। আমি এই ঘটনাটি কম্যিউনিষ্টদের বলার পর তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এবং আমাকে পূর্বে যে-ভাবে সাহায্য দিতেছিলেন সে ভাবেই সাহায্য দিচ্ছিলেন। চিনদেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করেই ঠিক করেছিলাম, যদি নিজের বর্ণের পরিচয় দিতে হয় তবে নমশূদ্র বলেই পরিচয় দেওয়া ভাল হবে, কারণ নাম এবং উপাধিতে বেশ খাপ খাবে। কেনাডাতেও আমি হরিজন বলেই পরিচয় দিয়েছিলাম। কেনেডিয়ান দ্বারওয়ান অর্থাৎ সহকারী ইমিগ্রেশন অফিসার হরিজন শ্রেণীর লোককেই বিনা পয়সায় খাটিয়ে সাহেব বাহাদুর হবার বাসনা মনে পোষণ করছিল। বৃদ্ধ দ্বারওয়ানের প্রতি আমার বেশ রাগ হয়েছিল, মুখে সে ভাব কিছুই প্রকাশ করিনি, কারণ তার দ্বারা আমার অনেক মতলব উদ্ধার করবার ইচ্ছা ছিল। লোকটিও আমাকে বেশ ভালবেসেছিল। পরের দিন সকাল বেলা যখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল তখন এক টুকরা কাগজ সে নিজের পকেট হতেই ফেলে দিয়েছিল। সেই কাগজ ফেলাটা আমি দেখেছিলাম। বৃদ্ধ সেই কাগজখানা উঠিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল "বোধ হয় আইরিশ বুক কাগজখানা আপনার জন্যে রেখে গিয়েছিল, আপনি দেখেন নি, দেখুন ত এতে কি লেখা আছে? "You are going to be tried in a special court. Your room is going to be searched to-day." আমার রুমে আমার কাছে আমার জানা মতে এবং পৃথিবীর কোন সরকারের বিরুদ্ধে 'কোন কাগজ ছিল না। পর্যটক কখনও এসবে যায় না। আমি পর্যটক, এ ভাবটা সকল সময় পোষণ করতাম এবং এখনও করে থাকি; সেজন্যই আমার পিঠ ঝোলায় কি আছে না আছে তা দেখিনি। তাই কি

করে তল্লাসী হয়, দেখবার অপেক্ষায় রইলাম। জাপানীরা অনেকবার আমার এই পিঠ্‌ঝোলার তল্লাসী নিয়েছে, এবার কেনাডিয়ানদের পালা। আমি নিশ্চিন্ত মনে প্রাতরাশ করলাম এবং সেদিনের সংবাদপত্র পাঠে মন দিলাম।

জেলের গেট্‌টা খুলে গেল। আমার রুমে দুজন ভদ্রলোক প্রবেশ করল। আমি তখন মিঃ হুভার মহাশয়ের শয়তানীর এক অধ্যায় সমাপ্ত করে অন্য অধ্যায়ের পাতা উল্‌টাতে ছিলাম। প্রথম ভদ্রলোক আমার কাছে এসে সুপ্রভাত না বলেই বলল :—এখন বুঝব তুমি কি রকম লোক।

আমি বললাম, তোমরা জেলে এনে লোককে মারপিট কর একথা ত জানতাম না, তোমরা আমাকে মারবে নাকি ?

না হে না, মারপিট আমরা করিনা, আমরা এখন জানব তুমি কজন লোক খুন করে এসেছ।

আমেরিকা এবং কেনেডাতে অনেক সময় ভাল লেখককেও জেলে এনে অস্ত্র করেদীর সাহায্যে হত্যা করা হয়, একথাটা আমি আমার খানসামা হতে শুনেছিলাম, ভয় হল হয়ত এরা আমাকে সেরূপই কিছু একটা করবে। কিন্তু তা করল না; একজন জিজ্ঞাসা করল—তোমার জিনিসপত্র কোথায়।

বেনেটকে জিজ্ঞাসা কর গিয়ে।

তাঁর কাছেই জমা দিয়েছ নাকি ?

আমি জমা দেইনি, জমা করা হয়েছে।

আচ্ছা তাই হবে, চল আমাদের সংগে।

তোমরা ইমিগ্রেসন জেলের লোক কি না তার প্রমাণ দেও তারপর যাব, নতুবা যাব না। তোমরা শেষটায় বলবে আমি নকল চাবি দিয়ে কপাট খুলে পালিয়েছি।

তাই নাকি ?

তাই বই কি।

আচ্ছা দেখব, বলে লোক দুটা ঘর হতে বের হয়ে গেল।

আমি আমার সংবাদপত্রে মন দিলাম। পৃথিবী ভ্রমণ করার সময় আমি মরবার জন্য এবং মারবার জন্য প্রত্যেক মুহূর্ত প্রস্তুত থাকতাম, সহজে কাউকে আমল দিতাম না। যতদিন শরীরের রক্ত :গরম থাকে ততদিন এই ভাবটুকু বজায় রাখা যায়। শরীরের বাঁধন শিথিল হলে নানা দুর্ভাবনা এসে দেখা দেয়।

কতক্ষণ পর একজন ইমিগ্রেসন অফিসার এসে দরজা খুলে আমাকে নমস্কার করার পর মনটা এতে অনেকটা হালকা হল। আমি জেলে থাকি আর জাহান্নামে থাকি, আমার বাসস্থানে যে আসবে সেই আমাকে নমস্কার প্রথম দিবে তারপর আমি করব প্রতি-নমস্কার, তা না করে দুটা গুণ্ডা আমাকে যা তা বলে কথা সুরু করেছিল বলেই এত রাগ হয়েছিল। ইমিগ্রেসন অফিসারের কাছে গিয়ে বললাম" আপনাদের এরূপ অভদ্রলোককে আমার এখানে পাঠান অন্যায় হয়েছে। লোক দুটা নমস্কার করাও শিখেনি।

ইমিগ্রেসন অফিসার জাপানী মতে "মিলিয়ন টাইমস" ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাকে অপিসে যেতে বললেন। আমি তার সংগে অপিসে গেলাম এবং মিঃ বেনেট আমাকে বসতে দিয়ে আমার পিঠ বোলা পরীক্ষা করা হবে বলে আমাকে জানালেন। আমি তাতে সম্মত হলাম এবং সেই দুটা গুণ্ডা, মনে হল পুলিশই হবে, তারা আমার কাগজপত্র দেখতে লাগল।

জাপান থেকে বিদায় নেবার সময় মিঃ শর্মা আমাকে কয়েকখানা আর্যসমাজীদের ধর্মবই পাঠ করতে দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম যদি

সময় পাই তবে জাহাজে বসে বইগুলি পাঠ করে একটা মন্তব্য তাঁর কাছে লেখে পাঠাব, কিন্তু বইগুলি দেখবার প্রবৃত্তিও আমার মনে জাগেনি। বইগুলির পেছনে কতকগুলি প্রবন্ধ ছিল তাতে ভারতীয় ধর্মবাদীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বেশ আক্রমণ করে অনেক কিছু লিখেছিল। আর সেই জিনিষটা কেনেডিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পড়ল। বইয়ের কয়েক-খানা পাতা পাঠ করেই একজন বলল "লোকটা নিশ্চয়ই বেংগল টেরারিষ্ট।" আমি বললাম "লোকটি" নয় "ভদ্রলোকটি" বলতে হয়। ভদ্রতা শিক্ষা করার পর হতে হয় কেপিটেলিষ্টদের ধামাধরা চাকর। আমার কথা শুনে মিঃ বেনেট আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আপনি তবে অদ্ভ ধারণা পোষণ করেন।" "নিশ্চয়ই মশাই, ধর্ম বই-এর পেছনে ছপাতা কি লেখে দিয়েছে তা দেখবারও ফুরসৎ হয়নি, তা বলেই ত আমি বই ক'খানা সাগর জলে নিক্ষেপ করিনি। যদি আমার মনে কোন কুমতলব থাকত তবে কেনেডা আসতাম না, নিজের দেশে থেকেই অনেক কাজ কর্ম করতে সক্ষম হতাম।" মিঃ বেনেট আমাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। গুণ্ডা দুটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

এখন থেকে আমার কাছে প্রায়ই লোক দেখা করতে আসতে লাগল, কিন্তু কোন হিন্দুই আর এসে দেখা করল না, শুনছিলাম তাদের নাকি ভয় দেখান হয়েছিল,আমার সংগে যদি তারা কথা বলে তবে কেনেডা সরকার তাদের কেনেডা হতে বের করে দিবেন। আমিও এই অবুঝ স্বদেশ প্রেমিকদের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিলাম বললে কোন দোষ হয় না।

একদিন আইরিশ খানসামা এসে জানাল আমার নামে একটা বড় মোকদ্দমা দায়ের হবে এবং তার বিচার জেলেই হবে, আমি সে সংবাদ শুনে সুখী হয়েছিলাম। বিচারে যদি জেল হয় তবে কেনেডার জেল-জীবন কেমন করে কাটে তাও জানতে পারব।

কয়েকদিন পর মিঃ বেনেট এসে বললেন—আমার বিচার হবে, কোন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করতে চাই কি না? আমি তাকে বলছিলাম—আমার কেস আমিই চালাব। ব্যারিষ্টার নিযুক্তির কোন দরকার নাই। বিচারের দিন সাব্যস্ত হল।

একদিন সুপ্রভাতে বেলা সাতটার সময় বিচার আরম্ভ হ'ল।

একজন ম্যাজিষ্ট্রেট বসলেন আমারই সামনে। তাঁরই পাশে একজন উকিল। একদিকে ইমিগ্রেসন বিভাগের লোক অন্যদিকে সরকারের লোক এবং কয়েকজন জুরী।

সর্বপ্রথমেই একজন বললেন "মিঃ বিশ্বাসের সংগে কখানা ধর্মবই আছে যার পেছনের ছুটা পাতায় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। যে-লোক এরূপ দলিল নিজের কাছে রাখে সে নিশ্চয়ই বৃটিশ সরকারের একজন বিদ্বেষী লোক। এই কথাটা নিয়ে সরকারী উকিল বেশ একটা লেকচার দিলেন। আমাকে কাগজ কলম দেওয়া হয়েছিল। নোট করে রাখলাম, সরকারী উকিল ভাল বক্তা নন।

ইমিগ্রেসন বিভাগ বলতে লাগলেন "আমাদের এখানে যতগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রয়েছে তাদের সংখ্যা এত বেশী যে অনুপাতে ইমিগ্রেসন বিভাগের নিয়ম মতে আর একজন ইষ্ট ইণ্ডিয়ানকেও এদেশে আসতে দেওয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত ভদ্রলোকের কাছে এত অর্থ নাই যাতে করে তিনি ইমিগ্রেসন বিভাগের দরকারী টাকা দেখাতে পারেন, অতএব তাঁকে নির্বাসন করা হউক এবং বর্তমান আইন অনুযায়ী জাপানী কোম্পানীকে আদেশ দেওয়া হউক যে কথিত ভদ্রলোককে যেস্থান হতে আনা হয়েছে সেই স্থানে যেন পৌঁছে দেওয়া হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট ওদের কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে সকল চার্জ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে কি না?

আমি বললাম মিঃ জজ এবং উপস্থিত ভদ্রমহাশয়গণ, আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলি চার্জই আনা হয়েছে। প্রথম চার্জটি সরকারী তরফের উকিল যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হল তাঁর ইংরাজী ভাষায় মোটেই দখল নাই। এরূপ লোককে কাজে রেখে কেনেডিয়ান সরকার নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হবেন। আমি ধরে নিয়েছি সরকারী উকিল একজন অনভিজ্ঞ লোক, তাই তিনি আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলি কিছু চিন্তা না করেই শেখানো কথার মত বলে গেছেন। আমার কাছে যে ক'খানা ধর্মবই ছিল তাতে বৃটিশ সরকারকেই নিন্দা করা হয়েছে। আপনারা কি ইণ্ডিয়া সরকারের পিস্‌তুতু ভাই যে বৃটিশ সরকারের কথা চিন্তা করেন? যদি তাই হয় তবে আমার বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই বলতে পারি এবং আমার জন্য জাপান হতে যে ভারতীয় ভদ্রলোক বই দিয়েছেন তাকে দায়ী করতে পারি এবং আমার বিশ্বাস তিনিও তা স্বীকার করবেন। অতএব জাপানের ভারতীয় ভদ্রলোককে ডেকে এনে বিচার করে শাস্তি দিলেই ভাল হবে, আমাকে কেন এ বিপদে ফেলছেন? যদি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিতে চান তবে আমি সে পিণ্ডি গ্রহণ করতে বাধ্য হব, কারণ আপনাদের মত শক্তিশালী ভূতদের তাড়াবার আমার কোন ক্ষমতা নাই।

ইমিগ্রেসন বিভাগ আমার নামে যে চার্জ এনেছেন তা সত্য নয়, আমার কাছে একশত আমেরিকান ডলার, ছাব্বিশ ইংলিশ ষ্টারলিং এবং দু'শত জাপানী ইয়েন আছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি জাপান দেশ হতে আগত একজন বৃটনের কাছে মাত্র দু'টি ইংলিশ ষ্টারলিং ছিল, তাকে কেনেডায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে, যদি তাকে কেনেডাতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হ'ত তবে তাকেও এখানে আজ দেখতে পেতেন।

আমি ভেবেছিলাম এদেশের লোক ভদ্র এবং অতিথিপরায়ণ, কিন্তু এখন দেখলাম আমার ধারণা ভুল। তাঁরা একজন পর্যটককেও তাদের দেশে কয়েক মাস থাকতে [illegible] নয়, অতএব এদেশে আমার কোন মতেই থাকা কর্তব্য নয়, আমি যেস্থান হতে এসেছিলাম সে স্থানেই চলে যাব ঠিক করেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট মাথা নত করে কি লিখলেন এবং অতি ধীরে পাঠ করে যাবার সময় আমার হাতে হাত রেখে বললেন, আপনার ভ্রমণ সফল হউক। আমি তাকে বলেছিলাম আমার ভ্রমণ নিশ্চয় সফল হবে, তা আমি জানি, এবং এটাও জানি আবার আমি কেনেডার আসব এবং আপনাদের দেশ ভ্রমণ করে যাব।

১৯৩৯ সালে আমি কেনেডায় ফের গিয়েছিলাম। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের দু'দিন থাকতে; বিচার হয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট চিঠির মারফতে জানালেন আমাকে দেশেই যেতে হবে। কিন্তু এদের কি বজ্জাতি তা ভাবলে মনে হয় এরা না করতে পারে এমন কোন কাজ নাই। এদের ধারণা ছিল আমি তাদের বিরুদ্ধে ঊর্ধ আদালতে আপিল করব, সেজন্য হিরে মারু যেদিন বন্দরে আসল সেদিনই বিচার করেছিল। এদের ধারণা ছিল আমি সত্যই হীন প্রবৃত্তির লোক। আমি কিন্তু আপিল করিনি।

বেলা দশটা আবার দরজা খুলল। একজন অফিসার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসেই বললেন, "চলুন, এখনই আপনাকে জাহাজে গিয়ে বসতে হবে।" আমি যতদূর সত্বর পারি পোষাক পরে লোকটার সংগে চললাম। আমার জিনিস সাইকেল এবং পিঠ ঝোলাটা একটা মোটরে উঠান হল। সেই মোটরকারেরই এক সিটে আমি গিয়ে বসলাম। মোটরকার হো হো করে চলে জেটিতে আসল। আমাকে নিয়ে একজন অফিসার একটি

কেবিনে প্রবেশ করলেন। সেই কেবিনে আরও তিনজন জাপানী ছিল। তাদের মুখ দেখে মনে হল তাদেরও এদেশ হতে তাড়ান হয়েছে। আমাকে নিয়ে ডিপোর্ট হবার লোক হলাম চারজন। আমি কেবিনে একখানা চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। অফিসারটি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার কাছ হতে বিদায় নিল এবং যাবার বেলা বার হতে কের তালা বন্ধ করে চলে গেল। আমি গোল খিরকী দিয়ে চেয়ে রইলাম। আমার বুকটা যেন ভেংগে যাচ্ছিল। আমার ভ্রমণে এবার বাধা পড়ল। করার কিছুই ছিল না, তাই নীরবে সময় কাটাতে লাগলাম।

কতক্ষণ পর কয়েকজন জাপানী এসে দরজা খুলল। তারা তাদের আত্মীয়দের সংগে কথা বলে বিদায়ের বেলা প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে কতকগুলি জাপানী নোট গুজে দিতে লাগল। পালাক্রমে তারা আমার কাছে এসেও নোট দিতে লাগল, আমি তাদের দিকে চেয়ে রয়েছিলাম মাত্র, কিছু বলবার ভাষা ছিলনা। এরা সবাই যখন চলে যাচ্ছিল তখন বললাম আমি জাপানী নই, আমি ইন্দোজীন্, ভুল করেছ টাকা দিওনা। তারা আমার দিকে আর চাইল না। দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

জাহাজ নংগর উঠাল, মোড় ফেরাল, তারপর পুরাদমে সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে পড়ল। কেবিনের দরজা খুলা হল আমি নোটগুলি গুণে পকেটে রেখে ডেকে গিয়ে বসলাম এবং কেনেডার পাইন বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত বনের দিকে চেয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম ইমিগ্রেসনের কথা—মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা নিয়ে পুঁজিবাদীদের ছিনিমিনি খেলার কথা। পুঁজিবাদীর দল এই পৃথিবীতে কত মায়ের কোল হতে কত ছেলে কেড়ে নিচ্ছে, স্বামী হতে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করছে, ভাইকে দিয়ে ভাইকে হত্যা করাচ্ছে তার হিসাব পুঁজিবাদীরাই রাখে। আমি এর বেশী কিছুই ভাবিনি।

জাহাজ বাহির সাগরে যাবার পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল এবং আমরা, কে কোন কেবিনে থাকব তাই দেখিয়ে দেওয়া হল। আমাকে যে কেবিন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে কেবিনে কয়েক জন চীনা এবং কয়েক জন জাপানীও ছিল। আমাকে দেখা মাত্র তারা কেবিন পরিত্যাগ করল। শুধু একজন মানচুরিয়াবাসী ইহুদী এবং একজন সোভিয়েট রুশ গেল না। আমার বার্থ নম্বরটি দেখেই আমি বাইরে চলে আসলাম এবং অস্পষ্ট কেনেডিয়ান দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

সেদিনই বিকাল বেলা জাহাজের পার্সার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "ফিরে যাবার ভাড়া আমি দিচ্ছি না কেনেডা সরকার দিচ্ছে?" আমি বললাম, "এন্, ওয়াই, কে, দিচ্ছে।" এই জাহাজ হল জাপানী এন্ ওয়াই, কে কোম্পানীর। আমার কথা শুনে লোকটার মন খারাপ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ কয়জন বয়কে কি বলে দিল। তারপরই বিকাল বেলা যখন খেতে গেলাম তখন দেখলাম আমার জন্য খাবারের অন্য বন্দোবস্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল তা একরূপ অখাদ্য বললেও দোষ হয় না। খাবার খেয়ে খাদ্যের গুণ গরিমা আমার কেবিনমেটদের বললাম এবং এও জানালাম যে যদি এরূপ খাদ্য খেতে হয় তবে আমার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। আমার কথা শুনে সোভিয়েট রুশ এবং ইহুদীর গাল লাল হয়ে গেল। তারা উত্তরে বলল "ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে খাবার এনে দেব।" সেদিনই লাল রুশ রুটি, মাখন চুরি করে এনে আমাকে খেতে দিয়েছিল। পরদিন থেকে শুধু তরল খাদ্য ছাড়া আর সকল রকমের খাদ্যই এরা আমার জন্য নিয়ে আসত।

ইহুদীর সংগে কয়েক খানা বই ছিল। তাই পড়ে আমার সময় কাটত। অনেক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম এবং উত্তর সাগরের শীতল বাতাস মাথায় লাগাতাম। এক দিন উত্তর সাগরের বাতাস লাগাতে গিয়ে ডেকে দাঁড়ালাম।

তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল, সূর্যের মিষ্টি আলো সমুদ্রের কালো জলে পড়ে' চক্ চক্ করছিল। এমনি সময় একদল তিমি মাছ জলের নীচ হতে উপরে উঠল আর কতক্ষণ পরই মাথা নীচের দিকে দিয়ে লেজটা সোজা করে জলে ডুব দিল। সে দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমন ভীতিপ্রদ। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখে কেবিনে চলে আসলাম। কেবিনে বসে থাকতে ভাল লাগল না। পৃথিবী ভ্রমণ কি করে সমাপ্ত করব তাই চিন্তা করতে লাগলাম। দুঃখের বিষয় এবিষয়ে কোনও সাহায্যকারী পাইনি যিনি আমাকে সৎ উপদেশ দিয়ে সাহসী করেন।

বার দিন পর আমাদের জাহাজ ইয়াকোহামার কাছে আসল। বারদিন আমরা ভূমি দেখিনি। এতদিন পর ভূমি দেখতে পেলাম। সকলেরই আনন্দ হ'ল আমারও হয়েছিল।আমাদের জাহাজ যখন ইয়াকোহামাতে আসল আমি মনে করলাম এবার আমি মুক্তি পাব। এবার আমি মনের আনন্দে ভ্রমণ করব; কিন্তু যখন আমার পাশপোর্ট জাহির করলাম তখন জাপানী কাষ্টমস্ অফিসার "মিলিয়ন বার" ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমাকে জাপানে নামতে দেবেন না; আমি তার কারণ জানতে চাইলাম। অফিসার ব লেন, কেনেডিয়ান সরকার যার নামে বদনাম এনেছে, তার স্থান জাপানে হতে পারে না। ইমিগ্রেসন অফিসার এর বেশি কিছুই বললেন না। আমি কোন কথা না বলে অন্ধকার কেবিনে এসে বাতি জ্বালিয়ে বসে চিন্তা করতে লাগলাম, এই কি এশিয়ার গৌরব জাপান? আমার মনে এই কথাটাই বার বার আঘাত করছিল। ভারতবাসী চীনের সাহায্য পেতে পারে কিন্তু চীনের স্বাধীনতা পদ্মপত্রের জলের মত টলমল করছিল অথচ এশিয়ার গৌরব জাপানীদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ছিলনা এবং এখনও নাই। চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটল, আমি একাকী বসে চিন্তা করছিলাম এমন সময় একটি জাপানী এসে আমার কাছে বসল। সে ধীরে ধীরে বলল, "আমি জানতাম তোমার দুর্দশা হবে তাই তোমাকে

এই বইগুলি পড়তে দিয়েছিলাম। জেনে রেখো বন্ধু, জাপানী ধনীরা বৃটিশ এবং আমেরিকান ধনীদের বড়ই ভয় করে। তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তোমার মত লোককে জলেও ফেলে দিতে পারে। তুমি চিন্তা করোনা। কোবেতে তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে। তুমি চীনের একটা ভিসা নিয়ে নিয়ো তবেই সকল বালাই হতে রক্ষা পাবে। চীন কনসাল তোমাকে যাতে ভিসা দেন তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো। লোকটি যেন আগুনে জল ছিটিয়ে দিল। আমার জ্বর ছেড়ে মাথা ঠাণ্ডা হল, কিন্তু সে আমার কাছে বসল না, চটপট করে কেবিন হতে বের হয়ে চলে গেল। যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলে গেছে। জাহাজে কোন যাত্রী রইল না, জাহাজে আমি একাকী, আর যারা ছিল তারা সবাই খালাসী।

ইয়াকোহামা হতে জাহাজ নাগোয়া এবং আরও দুটা জাপানী বন্দর হয়ে কোবেতে গেল। এখানে জাহাজ লাগাবার পরই বৃটিশ কনসালকে টেলিফোনে ডাকলাম। তিনি তার কেরাণীকে পাঠালেন। কেরাণী জাপানী প্রথামতে "মিলিয়ান টাইমস্" ক্ষমা না চেয়ে "I am afraid" বলে কথা শেষ করলেন। বুঝলাম আমার আর কোথাও কোনরূপ সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নাই, সিংগাপুরই চলে যেতে হবে। হঠাৎ মনে হল রামাণীর কথা। রামাণী একজন যুবক ব্যবসায়ী। তাকে ডাকলাম। সে জানালো বিকালে এসে কথা বলবে। কিন্তু তাকে যখন জানালাম বারটার পূর্বে অন্য জাহাজে পুরে আমাকে সাংহাই পাঠান হবে তখন সে আসতে রাজি হল এবং আসলও। জাপানী ভাষা তার বেশ জানা ছিল। সে যখন আসল তখন একজন অপরিচিত চীনা এসে "লিমনাথ" বলে চীৎকার করতে লাগল। আমি তার কথায় সাড়া দিলাম। সে আমাকে বলল কেনাডা হতে তার কোন আত্মীয়ের পত্র পেয়ে আমাকে নিতে

এসেছে। সে আমাকে নিয়ে পিকিং যাবে।" আমি তাকে সংগে আসতে বললাম। রামাণী আমাকে জাপানী পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে পনর হাজার ইয়েন জামিন হয়ে চার দিনের জন্য জাপান থাকার স্বাধীনতা কিনে আনল, আমি সেদিনই চীনা লোকটির সংগে চীনা কন্সালের বাড়ি গেলাম এবং চীন প্রবেশের ভিসা নিয়ে আসলাম। আমার মন হতে সকল কুচিন্তা একদম চলে গেল। যে চীনা আমার সংগে জাহাজে এসে দেখা করে পিকিনে নিয়ে যাবে বলেছিল সে আর কখনও আমার সংগে দেখা করে নি; জাপানী নাবিকের ত কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

চীন দেশে গিয়ে আমি প্রায় সকলের কাছ থেকেই ভাল ব্যবহার পেয়েছিলাম। চিয়াং কাই সেকের বিরুদ্ধে কম কথা বলিনি কিন্তু তিনি ভারতীয় গদর পার্টিকে মাসিক যা সাহায্য করতেন তা একটি মোটা টাকা। যারাই গদরপার্টির লোক বলে পরিচয় দিত এবং গদর পার্টিও যাদের নিজেদের লোক বলে স্বীকার .করত তারা সকলেই মাসে ত্রিশ ডলার করে পেত। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ মুখে মুখে বলতেন ধর্ম, কিন্তু অন্তরে ছিলেন কমিউনিষ্ট। চীন সরকার তা জানতেন, কিন্তু তা বলে তাঁকে ধরে এনে বৃটিশ সরকারের কাছে হাজির করেন নি, চীন দেশে তাঁকে নিরাপদে বাস করতে দিয়েছিলেন। যখন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বুঝলেন, জাপান উত্তর চীন সত্বরই আক্রমণ করবে তখন মনের কথা আরও চেপে জাপানেই চলে গলেন। তাঁর সাহস ছিল না চীনের কমিউনিষ্ট দলের সংগে মিশে গিয়ে নতুন ভাবে জীবন সুরু করেন। বয়স যখন বাড়ে তখন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না, লোক চায় একটু আরাম। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও আরামের পক্ষপাতী হয়েই বৃটিশের বিপরীত ক্যাম্পে থাকাই পছন্দ করলেন। দ্বিতীয় দিন যখন তাঁর সংগে কোবেতে দেখা হয় তখন তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন

যদি তিনি জানতেন জাপান এরূপ হবে তবে তিনি জাপানে আসতেন না। কেন তিনি আমাকে একথা বলেছিলেন তারই কথা এখানে বলছি।

দুপুর বেলা রাজার সংগে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে কতকগুলি ধর্ম মন্দিরে নিয়ে যান। ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। আমি তাঁর প্রত্যেক কথায় সায় দিতে থাকি। একটা ধর্ম মন্দির হতে বের হচ্ছি এমনি সময় রাজা একদম রক্তচক্ষু করে বললেন, "আপ সাম্রাজ্যবাদ লব্জ্‌কা ক্যা মতলব জানতেহে?" "হাঁ সাহেব" বলে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাজা রাগ করে বললেন "জাপানভি সাম্রাজ্যবাদী এবাত ইয়াদ রাখ্‌না।" আমি রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম "রাজা সাহেব, জাপান যে সাম্রাজ্যবাদী তা আমি জানি। রাজা আমার হাত ধরে বললেন "জাপান আউর বৃটেন যে কভি কমিউনিষ্টলোগোকো আচ্ছা কারেম নাহি হোগা, এ বাত ভি ইয়াদ রাখনা।" আমি মাথা নাড়লাম। রাজা আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাসার দিকে রওয়ানা হলেন।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দেশেতে কি করেছিলেন তা সবাই জানে কিন্তু জাপানে যাবার পর তাঁর কি কষ্ট হয়েছিল তা অতি অল্প লোকই অবগত আছে। আজ তার একটুমাত্র বলব। তিনি জাপান পৌছার একমাস পর বৃটিশ সরকার যখন বুঝলেন রাসবিহারী জাপানে আছেন, তখন জাপান সরকারকে বৃটিশ সরকার রাসবিহারীবাবুকে ভারতে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। জাপান সরকারও তাতে রাজী হন।

যারা পুরাতন আর্য রাজনীতির পক্ষপাতী তাদের বলছি বর্তমানের রাজনীতিতে সেই আদিম যুগের রাষ্ট্রনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। বর্তমান রাজনীতি অন্য ধরণের। যাঁরা এখনও জাপানকে মিত্র ভাবেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি, জাপান ভারতবাসীর মিত্র কোন মতেই হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ভারত হারিয়ে যেমন করে শুকিয়ে মরবে তেমনি

সাম্রাজ্যবাদী জাপানও ভাল করে জানে, যদি ভারত স্বাধীন হয় তবে স্বল্পবুদ্ধি জাপানীদের পৃথিবীর বীর ও বুদ্ধিমান ভারতবাসীর কাছে মাথা নত করে থাকতেই হবে। সেজন্যই পলাতক রাসবিহারীকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিল।

রাসবিহারীর দোষ এবং গুণের সমালোচনা করার অধিকার আমার নাই, আমি শুধু এখানে বলব, কি করে চতুর বাংগালী জাপানী সাম্রাজ্যবাদীকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে ছয়টি মাস আত্মগোপন করে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জাপানীরা তাদের পাদুকা ঘরের ভেতর নেয় না। রাসবিহারী তখন জাপানী পোষাক পরতে আরম্ভ করেছেন এবং সেই সংগে জাপানী খড়মও ব্যবহার করছিলেন। রাতে বেশ তুষারপাত হয়েছিল। পথগুলি তখনও বরফে আবৃত ছিল। রাসবিহারী গলিপথ ধরে তখনকার দিনের এক মামুলী মন্ত্রীর ঘরে উপস্থিত হন। মন্ত্রী কন্যা তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে। রাসবিহারী মন্ত্রী কন্যার সংগে বসে যখন চা খাচ্ছিলেন তখন সেই পরিবারেরই একটি ছেলে এসে জানাল পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রাসবিহারী বুঝলেন এবার তাকে বুঝে কাজ করতে হবে। তিনি ভাল করে জানতেন, পালিয়ে যদি যান এবং ধরা পরেন তবে তাঁকে শমন ভবনই গমন করতে হবে। আর যদি ধরা না পরেন তবে বেঁচে থাকবেন মাত্র। তিনি বেঁচে থাকাটাই পছন্দ করলেন এবং পেছন দরজা দিয়ে মন্ত্রী কন্যার সংগে নিকটস্থ গেইসা বালিকাদের আড্ডায় গিয়ে তাদের পোশাক পরে এবং পরচুল লাগিয়ে গেইসা বেশে থাকতে লাগলেন। তাকে ছয়টি মাস জাপানী পুলিশ খুঁজে পায়নি। অবশেষে তিনি ব্রেকড্রেগণদের সাহায্যে জাপানী প্রজা হতে সক্ষম হন। সাম্রাজ্যবাদী জাপানী এবং ব্রেক ড্রেগণ এক জিনিস নয়। ব্রেকড্রেগণদের জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ফ্যানাটিক, ন্যাসনেলিষ্ট

বলেই ঘর্ষ করে এবং দরকার হলে গাল দিতেও কসুর করে না। যদিও এসব কথা এখানে বলার ইচ্ছা ছিল না তবুও বলে ফেল্লাম কারণ মরণ এসে কোন দিন শমন জারি করে তার স্থিরতা নাই।

এসব কথা রাসবিহারী যেদিন আমার কাছে বলেছিলেন সেদিন তিনি আমার কাছ হতে চীন দেশে জাপানী এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের তাণ্ডব লীলার কথা শুনেছিলেন। এতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম জাপান "চাচা আপন বাচার দলের সাম্রাজ্যবাদী।" সেই দুর্বল এবং লোভী আমাকে নিশ্চয়ই স্থান দিতে অসমর্থ ছিল কারণ কেনেডা সরকার আমাকে তাদের দেশ হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। জাপানের আশপাশের সমুদ্র একদম নিশ্চল। চারদিন জাপানে বাস করে পন্‌চম দিন সকাল বেলা জাহাজে এসে উঠলাম। এবার আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নই; দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে খাওয়া থাকা আরামের। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর প্রতি বয় বাবুর্চি সবাই অন্য রকমের ব্যবহার করে। আমার প্রতিও সেরূপ কপট ব্যবহারের কোনরূপ কমতি হয়নি দেখে সুখীই হয়েছিলাম।

জাহাজ ছেড়ে দেবার পর কয়েক ঘন্টার মাঝেই দু'একজন ইউরোপীয়ান এবং বিশিষ্ট কয়েকজন জাপানীর সংগে আমার পরিচয় হয়। পরিচিত ভদ্রলোকদের মাঝে কয়েকজন পণ্ডিত লোকও ছিলেন। শিক্ষিত লোকের সংগে মিলামিশা আমি সকল সময়ই পছন্দ করি। এসব শিক্ষিতদের মাঝে একজন জার্মান ভদ্রলোক ভারতীয় পৌরাণিক তথ্য নিয়ে আজীবন গবেষণা করছিলেন। এই বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁর ভারতীয় তথ্য সংগ্রহে অদম্য স্পৃহা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তিনি সারাটা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন এবং আরও ভ্রমণ করবেন সেকথাই বললেন। তাঁর কাছে বর্ত্তমান

রুশদেশের উন্নতির কথা শুনলাম এবং তিনি মঁসিয়ে ষ্টালিনের এত প্রশংসা করলেন যে, যদি আমি সেসব কথা এখানে বলি তবে একখানা বই হয়ে যাবে। রুশিয়ার বর্তমান পররাষ্ট্রীয় কূটনীতির কথাও তিনি আমাকে বললেন। এসব লোক বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং অতীতের কথা এমন সুন্দর করে বলেন, যা শুনলে মনে হয় তারা যেন এক একজন পয়গম্বর। এই ভদ্রলোকের কাছেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির কথাও শুনেছিলাম। তিনি যা বলেছিলেন তার প্রত্যেকটি কথা আজ পর্যন্ত মিলছে; ভবিষ্যতে মিলবে কিনা তা জানি না। আমার মনে হয় তিনি যেন বলেছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে হাত মিলাতে বাধ্য হবে। সেই কথাটি যদি ঘটে তবে অজ্ঞাতনামা সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, রুশদেশবাসী জার্মাণ ভদ্রলোককে আমি পয়গম্বর বলেই স্বীকার করে নিব। কিন্তু তা হবে না।

এই অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোক ভারতীয় পৌরাণিক তথ্য অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁকে যে কোন ভারতীয় সত্যিকারের পণ্ডিতের সমকক্ষ বললে দোষ হবে না। তিনি বেদ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আমার কাছে করেছিলেন তা অতীব সুন্দর। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে এবং হবে। অতএব আমরা যে চারখানা কেতাবে বেদকে আবদ্ধ করে রাখি তা অতীব অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত। এই ভদ্রলোকের সংগে চারদিন সময় কাটিয়ে মনে হয়েছিল এরূপ লোকের সংগেই যদি সারাটা জীবন কাটে তবে সে জীবন হবে আনন্দময়। চারদিন পর যখন জাহাজ সাংহাইএ আসল, তখন সকলের কাছ হতে বিদায় নিয়ে যখন স্মোকিং রুমে (সিগারেট খাবার ঘরে) গিয়ে বসলাম তখন দেখা হল একজন বন্ধুর সংগে। তিনি কাষ্টম অপিসে কাজ করেন। তাঁকে দেখে এত আনন্দ হয়েছিল যে ইচ্ছা হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তাকে জড়িয়ে ধরি, কিন্তু তারই ইংগিতে কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ না করে সাধারণ যাত্রীর মত জাহাজ হতে নেমে পড়লাম। সাইকেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়

একজন চীনা বলল, "এশিয়া হোটেলে যান, রুম নম্বর ৩৫২ আপনার জন্য ঠিক করা আছে।" আমি কোথাও না গিয়ে এশিয়া হোটেলে এসে ৩৫২ নং দখল করলাম। এই কাষ্টম অফিসার টেলিফোন যোগে আমার জন্য রুম ঠিক করে দিয়েছিলেন।

সাংহাই

প্রথমবার জাপানীরা চাপাই এলাকার যে সকল স্থান দখল করেছিল, তার সবই পরিত্যাগ করেছিল। চাপাই নতুন করে গড়তে শুরু হয়েছিল। ব্যবসায়ীরা অকাতরে অর্থ খরচ করছিল, কিন্তু একটী কোম্পানী একেবারে সকল কাজ বন্ধ করে দিয়ে উধাও হয়েছিল। সেটি হল কমার্শিয়াল প্রেস। কমার্শিয়াল প্রেসের প্রতি জাপানীরা যতটুকু অত্যাচার করেছিল তার চেয়ে বেশী অত্যাচার শুরু হয়েছিল চীনাদের দ্বারা। যারা কমার্শিয়াল প্রেসে পিয়নের কাজও করেছিল তারাও অত্যাচার হতে রেহাই পায়নি। তাদেরও পলায়ন করে জান বাঁচাতে হয়েছিল। যারা দেশের মুক্তি চায় তারা ঘরে বাইরে সর্বত্র নিগৃহীত হয়, পশুপ্রকৃতির মানুষের দ্বারা।

জাপানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত চাপাই এলাকা দেখবার মত স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি প্রায়ই তথায় যেতাম এবং বেশ ভাল করে স্থানটা দেখে আসতাম। এর পরও অনেক কিছু জানবার বিষয় ছিল, কিন্তু গতবারের মত আমি শান্তি পেতাম না। পৃথিবীর কোনদিকে যাই, কি করে যাই তাই শুধু আমার মাথায় ভন্ ভন্ করত। তারপর একজন লোক যেন আমার পেছন পেছন সকল সময়ই ঘুরত। এরূপ লোক আমার পেছন নেওয়া সম্ভব

এবং অন্যায় নয়। আমি নানা লোকের সংগে মিশতাম। যে সকল লোকের সংগে মিশতাম তাদের প্রতি সামান্য গুরুত্বও আমি দিতাম না, কিন্তু যারা আমাকে ঘুরতে দেখত তারা ভাবত, আমি একজন বড় দরের পলিটিক্স-এর চাই। পলিটিক্স যারা করে তারা বৃহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা ছাড়া সবই ভুলে যায়। আর আমি আমার মতলব সিদ্ধি করার জন্য সবই ভুলে যেতাম। প্রভেদ এখানেই। আমি ভাবতাম, যেহেতু আমার মনে কোন বদমতলব নাই, আমি একজন পর্যটক মাত্র অতএব আমাকে সবাই নির্দোষ প্রকৃতির লোক বলেই ধরে নেবে ; সেরূপ ধারণা করা মহা অন্যায়। যে সকল দেশ রাষ্ট্রনীতিতে উন্নতি লাভ করেছে সেই দেশগুলিতে যারা কোনরূপ বিদ্রোহ আনবার চেষ্টা করে তাদের লোকান্তরালেই থাকতে হয়। তারা শত্রুর সংগে পুরাদমেই দুষমনী করে, কোনরূপ দয়া দেখায় না। শত্রুও তেমনিই ব্যবহার করে। যারা বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করেছেন তারাই বিষয়টা ভাল করে বুঝতে পারবেন। কিন্তু আমি অবুঝ দেশের নির্বোধ পর্যটক, তাই আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল।

কয়েকদিন সাংহাই থাকবার পর একদিন দ্বিপ্রহরে আমি একটা প্রভিসনের দোকান হতে কাফি কিনে আনতে গিয়েছিলাম। সাংহাই-এ কাফি নানা রকমের পাওয়া যায়। যাতে ভাল কাফি কিনতে পারি সেজন্য অনেকগুলি দোকানে যেতে হয়েছিল এবং ফিরে আসতে প্রায় তিনটা বেজে যায়। হোটেলে আসামাত্র মালিক আমাকে জানালো যে, একটা বাংগালী (একজন শিখ) আমার খোঁজে এসেছিল। আমাকে না পেয়ে দরজার দিকে মুষ্টিবদ্ধ করে কি বলে এবং ভয়ানক রাগ দেখায়। সে বলে গেছে— আমি আসা মাত্রই যেন বৃটিশ পুলিশ ষ্টেশনে যাই। আমি হয়ত মোটেই সেদিন তথায় যেতাম না, আর একবারেই যদি না যেতাম তবে বৃটিশ পুলিশ আমার কিছুই করতে পারত না।

তখনকার দিনে কোন বলাৎকারী আইন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সাংহাই নগরে প্রয়োগ করতেও লজ্জাবোধ করত। এসব কথা মন থেকে ঠেলে দিয়ে শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পুলিশ কমিশনারের সংগে সাক্ষাৎ করে সেই ভারতীয় নির্লজ্জ পশুটার বদ ব্যবহারের কথা বলায় তৎক্ষণাৎ পুলিশ কমিশনার লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। সে এসেই পুলিশ কমিশনারকে লম্বা একটা সেলাম করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চেয়ার হতে উঠে সর্বপ্রথম লোকটাকে হিন্দিতে বললাম, "তোমার জানা উচিত, তুমি যে পুলিশ কমিশনারের কাছে কাজ কর এবং যাঁর হুকুম তামিল করার জন্য গিয়েছিলে সেই পুলিশ কমিশনার আমার কিছুই করতে পারেন না। তুমি ভারতের লোক। তোমার মনে রাখা উচিত এটা ভারতবর্ষ নয়। ভারতে যদি তোমার মত কুকুরকে লেলিয়ে দেয় তবে তুমি লোকটাকে আধমরা করে এনে হাজির করবে।" এতগুলি কথা বলে মুখ ফিরিয়ে ইউরোপীয় পুলিশ কমিশনারকে সকল কথা ইংলিশে অনুবাদ করে বললাম। তিনি আমার কথা শুনে কিছুই বললেন না শুধু লোকটাকে চলে যেতে বললেন। তারপর আমার সংগে অন্য কথা সুরু হল। যে সকল কথা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে হয়েছিল তার সারমর্ম এখানে বলাই ভাল। তাকে আমি বলেছিলাম," ভারতবর্ষে বৃটিশ কোন মতেই শাসন করতে পারত না, যদি এক শ্রেণীর ভারতবাসী গোড়া হতেই বৃটিশের সাহায্য না করত এবং এখনও বৃটিশ, ভারতবর্ষ শাসন করতে পারে না যদি এক শ্রেণীর ভারতবাসী বৃটিশের সাহায্য না করে। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি ভারতবাসীর পক্ষ হয়েই বৃটিশ ভারতবর্ষ শাসন করছে।" রাগের মাথায় আরও অনেক কথা বলেছিলাম। অবশ্য তখন যা বলেছিলাম, বর্তমানের সংগে তার কোন সম্পর্ক নাই অথবা প্রকৃত তথ্যের সংগেও কোনরূপ খাপ খায় না। রাগের মাথায় কত কথা কত লোকই বলে থাকে। পুলিশ কমিশনার

সুখীই হয়েছিলেন, নতুবা তিনি আমাকে কয়েকটি সৎ উপদেশ দিতেন না। তিনি বলেছিলেন, "আমার দ্বারা আপনার কোন উপকারই হবে না, কারণ ইন্‌টেলিজেন্ট ব্রান্‌চের খাতায় আপনার নাম উঠে গেছে, তবুও আপনি একবার সিংগাপুরের বলরাম সিং অথবা মিঃ মেথা এবং রেংগুনের মিঃ ঘোষালের কাছে সকল কথা বললে হয়ত আপনার অনেক উপকার হতে পারে।" পুলিশ কমিশনারের কথামত আমি এদের সংগে সাক্ষাৎ করি এবং আমার ভ্রমণ কথা খুলে বলি, কিন্তু কতকগুলি লোভী গোমুর্খের অন্যায় কাজে আমাকে মহাবিপদে পড়তে হয়েছিল সেই বিষয়গুলিই হল প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তির চমকপ্রদ ঘটনাবলী।

যে জাতের মেরুদণ্ড শক্ত এবং যাদের মাঝে উপযুক্ত নেতা আছে সে জাতির কখনও ধ্বংস হয় না। আমাদের দেশে মধ্যযুগে উপযুক্ত নেতার অভাবে এবং ধর্মের বদখেয়ালীতে জাতও গড়েনি এবং সেজন্য মেরুদণ্ডের কথাও আসে না। এজন্যই আমাদের দেশের চাষা শ্রেণীর লোক হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে শুধু হুকুমই তামিল করতে শিখেছে। হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কিছু করার কিছু যে আছে সে জ্ঞান তথাকথিত ধর্ম এবং ভগবান সবই অপহরণ করে ভারতবাসীকে এত পিছিয়ে দিয়েছে যে এখন আমাদের দাঁড়াবার ক্ষমতাও হয়নি। অনেক সময় তর্ক করে আমরা বলি, আমাদের এটা ছিল, ওটা ছিল; কিন্তু এখন যে কিছুই নাই সে কথা আমরা মোটেই ভাবি না। পুলিশ কমিশনারের সংগে সাক্ষাতের পর পুনরায় আমি আমার সাধারণ অবস্থার কতকটা ফিরে এসেছিলাম।

পর্যটকের জীবন বড়ই আরামের যদি সে জীবনকে হেসে খেলে কাটানো যায়। আমার জীবনও সেরূপই ছিল। আমি নতুন করে সাংহাইএ নানা

শ্রেণীর লোকের সংগে মিশতে লাগলাম। "সিন-মিন-সুয়ে" বলে একটা সমিতি তখনকার দিনে সাংহাইএ বেশ শক্ত করে খুঁটি গেড়েছিল। এই সমিতিকে শুধু চিয়াং কাইসেকই ভয় করতেন না, পৃথিবীর যত সাম্রাজ্যবাদী আছেন তাঁরা সবাই ভয় করতেন। সিন-মিন-সুয়ে প্রথম গড়ে তুলেছিলেন মাও সু তন্। যখন তিনি হুনান এবং অন্যান্য প্রদেশে কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখনও এই দলের লোক চীন দেশের সর্বত্র নিজেদের কাজ বাড়িয়েই চলত। এদের শরীরে কখনও অবসাদ আসত না এবং এরা যেমন করে তাদের দলের বিশ্বাসঘাতকদের নির্মমভাবে হত্যা করত তেমনটি আর কেউ করত না। এই দলের লোক নানাভাবে নানাস্থানে আত্মগোপন করে থাকত। সাংহাইএ তখনকার দিনে চীনা, জাপানী, ইউরোপীয়, আমেরিকান গোয়েন্দাগণ এই দলের লোককে যাতে সাংহাই হতে সরাতে পারে তার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করার ফলে প্রায় সর্বদাই নির্দোষ লোকেই শাস্তি পেত, আসল লোকের পাত্তাটিও পাওয়া যেত না। সেজন্যই সিন-মিন-সুয়ে এত কৃতকার্য হতে পেরেছিল। যারা চীন সম্বন্ধে মামুলী সংবাদ রাখেন তারাই সিন-মিন-সুয়ের কথা বেশ ভাল করে অবগত আছেন। আমি ইচ্ছা করেই একদিন একজন ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ীকে সিন-মিন-সুয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার কথা শুনেই তিনি চমকে উঠেন এবং মুখ বন্ধ করতে ইংগিত করেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন পান্‌জাবী মুসলমান এবং সিংগাপুরের ইন্‌টেলিজেন্ট ব্রান্‌চের মিঃ মেথার বন্ধু। বোধ হয় তিনি এ বিষয় অনেক জানতেন তাই মুখ বন্ধ করেছিলেন। পান্‌জাবী মুসলমানরা যখন বিদেশে গিয়ে বিপাকে পতিত হয় তখন তারা বড়ই স্বদেশপ্রেমিক হয়ে থাকে। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক বিদেশে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছিলেন তাই আপনা হতেই তিনি দেশভক্ত হয়ে যান। কিন্তু কথা হল তিনি কি করে মিঃ মেথার সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন তা এখনও আমার ধারণার অতীত। তিনি কিন্তু

আমাকে সিন-মিন-সুয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। যাকে যা হতে দূরে থাকতে বলা হয় সে সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে—আমিও সিন-মিন-সুয়ের আসল সংবাদ জানার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। কথিত পান্‌জাবী ভদ্রলোক ছাড়া আর কোন ভারতবাসী সিন-মিন-সুয়েদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখত না। নেসনেলিষ্ট সরকার যখন কোন কমিউনিষ্টকে হত্যা করতেন ভারতবাসীরা বলত একটা ডাকাতকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে অথবা গুলি করে মারা হয়েছে।

আমি যখন সিন-মিন-সুয়ের সংবাদ কোন মতেই পেলাম না এবং ফিলি-পাইন যাবার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত ছিলাম তখন একদিন হঠাৎ আমার পূর্ব পরিচিত কাষ্টম অফিসারের সংগে পথের মাঝে দেখা হল। আমি রিকসায় বসা ছিলাম, তিনিও রিকসাতেই ছিলেন। উভয়ে বিপরীত দিকে চলছিলাম; চিৎকার করে;তিনি বললেন 'দেখা হবে'। আমি হাত নেড়ে জানালাম, তথাস্ত। দেখা অনেকদিন পরে হয়েছিল।

দিন যায়। আমাকে আর একটি সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। সার্টিফিকেট ত নয়, তা একটি জামিন পত্রে স্বাক্ষর করান। সেই জামিন পত্রের সারমর্ম হল যদি মেনিলাতে গিয়ে আমি অর্থাভাবে পতিত হই, এবং কোন সাহায্য বৃটিশ কনসালের কাছে চাই তবে মেনিলার আমেরিকা সরকার আমাকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হতে বহিষ্কৃত করবেন। বহিষ্কারের সময় যে অর্থব্যয় হবে সেই টাকা জামিন পত্রে স্বাক্ষরকারীদের দিতে হবে। মিঃ নায়ার এবং মিঃ ক্রন্‌জি বলে দুই ভদ্রলোক জামিন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, আমি তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধানে ছিলাম। মিঃ চেন বলে এক ভদ্রলোক সে জামিন পত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তার মনের পরিবর্তন হয় এবং জামিন পত্রে স্বাক্ষর করার জন্য দুতিন দিন সময় চেয়ে বসেন; এরই মাঝে দেখা হল কাষ্টম অফিসারের সঙ্গে।

রাত তখন সাড়ে বারটা। চীনা সিনেমা দেখে ফিরছি এমনি সময় একটা লোক আর একটি লোককে লক্ষ্য করে বেশ লম্বা একটা বোমা ছুড়ে মারামাত্র লোকটার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হল উপরন্তু যে দোকানে লোকটি বসেছিল সেই দোকানে আগুন ধরে গেল। অনেক লোক আহত হল। ফ্রেনচ্, বৃটিশ, জাপানী, চীনা সকল রকমের পুলিশ এসে জড় হল। চীনারা নীরবে পথ চলে যেতে লাগল; কেউ আহতদের প্রতি তাকালও না। দর্শকের মাঝে যারা ছিল, সবাই বিদেশী। বিদেশীদের মাঝে সাদা রুশ, এমেরিকান, বৃটিশ এবং আমিই ছিলাম। পুলিশ চারদিকে যে কোন চীনাকে পেতে লাগল তারই অনুসন্ধান নিতে লাগল। সেরূপ অনুসন্ধান অনেকক্ষণ দেখলাম, তারপর আমরা আপন আপন পথ ধরলাম। ইউরোপীয়গণ অনেকেই মন্তব্য করল, এই বলে যে লোকটা চোর, দোকানে চুরি করতে না পেরে বোমা ফেলে গেছে। আমি কিন্তু কিছুই মন্তব্য করিনি।

হোটেলে আসতে প্রায় দেড়টা বেজে গেল। তখনও অনেক কামরায় বারবনিতাগণ ধনী চীনাদের আফিংএর পাইপে আফিং দিয়ে যাচ্ছিল। অনেক ঘর হতে বিশ্রী গন্ধ আসছিল। এসব দুর্গন্ধ এড়াবার জন্য ঘরে এসেই আমি খিড়কী দরজাটা খুলে দিলাম। গভীর রাত্রের স্নিগ্ধ বাতাস নবজীবন এনে দিল। আমি কাফি বানাতে মন দিলাম, এমনি সময় দরজায় কে টোকা দিল। আমি বুঝতে পারলাম এমন সময় পুরাতন বন্ধু ছাড়া আর কেহ এসে দরজায় টোকা দেবে না। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখি আমার অনুমান সত্য। মিঃ ওয়াং ঘরে এসে বসলেন এবং আমার বই লেখার কি পর্যন্ত হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে জানালাম বই লেখার সময় এখনও হয়নি, তবে আমি ভারতে গিয়ে বই লেখার পূর্বে কতকগুলি লেকচার দেব তাতে বোধ হয় অনেক কাজ হবে। আমার কথা শুনে মিঃ ওয়াং সুখী হলেন। আমি ফিলিপাইন গিয়েও চীন সম্বন্ধে লেকচার দেব বলায় তিনি আমার

ফিলিপাইন যাবার সহায়তা করবেন বলেই মনে হল। সেদিন আর কথা হল না, মিঃ ওয়াং বেরিয়ে যাবার পূর্বে হঠাৎ আমার চৌদ্দপুরুষ তুলে গালি দিয়ে বের হতে যাচ্ছেন এমন সময় আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম আমি ত কমরেড হই নি, তবে কেন এত ভালবাসা দেখাচ্ছেন। মিঃ ওয়াং আর কথা না বলেই চলে গেলেন। চীনাদের মাঝে যখন গভীর ভালবাসা হয় তখন তারা একে অন্যের পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় কুলের বেশ খিস্তি করে থাকে। সেই অবস্থায় না পৌঁছা পর্যন্ত মনে করতে হবে চীনাম্যানের সংগে মোটেই অন্তরংগতা হয় নি।

ভোর হয়েগেছে। পথ ঘাটে লোক চলতে আরম্ভ করেছে। অন্ধ চারণী পথে গেয়ে চলেছে "সেই ছাত্র নিপীড়ন, রাখিও স্মরণ, রেখো মনে জাপানীর সে মূরতি ভীষণ রে।" গানের সুর বড়ই করুণাদায়ক কিন্তু কি গাইছে তা মোটেই বুঝিনি। সকালে উঠেই গানটার অর্থ জেনে নিলাম। আমি ভেবেছিলাম জাপানীদের বিরুদ্ধেই গানটা তৈরী করা হয়েছিল, শেষটায় বুঝলাম তা নয়; গানটার অর্থ হবে "সেই ছাত্র নিপীড়ন রাখিও স্মরণ, রেখো মনে পুঁজিবাদীর সে মূরতি ভীষণ রে।" চীন দেশে অত্যাচার কম হয়নি। চীনের উন্নতিকামী ছাত্রদের প্রতি ঘরের লোক এবং বাইরের লোক সবাই অত্যাচার করেছে। কত রকমে অত্যাচার করা হয়েছে তা কে জানে। যখনই কোন মহাপুরুষ তাঁর দেশের উন্নতি করতে চেষ্টা করেছেন তখনই তাদের প্রতি বেজায় অত্যাচার হয়েছে। বিনা অত্যাচারে কারো প্রাণে চেতনা আসেনি, চেতনা আসতেও পারে না। এসব কথা সবাই জানে কিন্তু অত্যাচার সহ্য করার মত মন কার কতদিন থাকে? যার মন যত কঠিন এবং যত উন্নত সে তত অধিকদিন বর্বরদের অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। রাণা প্রতাপ তার একটি দৃষ্টান্ত। তবে চীনের ছাত্র এবং ছাত্রীরা কোন্ স্তরের বলতে পারি না তারা অত্যাচার সহ্য ক'র

অত্যাচারীর সংগে যেমন করে লড়েছে, পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত অতি কম। এরূপ চিন্তা করেই বোধ হয় সে দিনটা কেটে যেত, কিন্তু তাতে একটা বেশ বড় রকমের বাধা পড়ল। আমার সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য এক ডাক্তার আসলেন। তার বাড়ি ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে। তিনি এসেই আমাকে বেলা তিনটার সময় খাবার খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আড়াইটার সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখি অন্যান্য কয়েকজন লোকও সেখানে বসে আছেন তার মাঝে একজন আমার পরিচিত। তিনি হলেন মিঃ ওয়াং। মিঃ ওয়াং বেশি কথা বললেন না শুধু অপরের কথা শুনে যেতেই লাগলেন। খাবার শেষ হয়ে যাবার পর ডাক্তারের স্ত্রী আমার সংগে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথায় এমন কিছু ছিল না যা এখানে বললে কারো কোন উপকার হবে। মিঃ ওয়াং শুধু আমাকে বললেন সিন-মিন-সুয়ে কোন দলের লোক যদি জানতে চান তবে এই পর্যন্ত জেনে রাখুন, যারা কমিউনিজম কায়েম করতে তাদের যথা সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে তারাই সিন-মিন-সুয়ে। এদের আপনি খুঁজে পাবেন না। তারা কখনও সভা করে না, তারা কখনও কয়েকজন একত্রিত হয় না। তারা চীনের সর্বত্র বিরাজ করছে। তাদের সংগে জাপানের ব্লেকড্রেগনের তুলনা হতে পারে, এবং ব্লেকড্রেগনের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে তবে আছে সিন-মিন-সুয়ে। কথাটা শুনে আমার মুখ ঝলসে উঠল। আমি সিগারেটে কশে দম দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থেকে মনের ভাব গোপন করলাম। মুখ লুকাবার চেষ্টা করলাম সত্যকথা, কিন্তু কতক্ষণ মুখ লুকিয়ে থাকা চলে? শেষটায় যখন উঠতে যাচ্ছি তখন মিঃ ওয়াং বললেন আজই মিঃ চেন আপনার কাগজে সই করে দেবেন, কাল সকালে তাই নিয়ে আপনি আমেরিকার কনসাল অপিসে যাবেন। আমি নীরবে মাথা নত করে হোটেলে চলে আসলাম এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমেরিকার কনসালের বাড়িতে সকাল বেলাই রওয়ানা হলাম, পথে দেখা

হল জনৈক পরিচিত সিংহলীর সংগে। সিংহলী লোকটি আমার সংগে কথা না বলে আমার পেছন নিয়েছিল। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং তাকে বেশ স্পষ্ট করে বললাম "আমেরিকার কনসাল আমাকে আজ ভিসা দেবেন, আপনি সত্বর আপনার উর্দ্ধতন কর্মচারীদের সংবাদ দেন যাতে করে আমি ভিসা না পাই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দেখতে না পারি। বৃটিশ কনসালের কাছে যাবেন তবেই কাজ হাসিল হবে। লোকটা আমাকে আমেরিকার কনসালের বাড়ীর দরজার সামনে রেখে বোধহয় বৃটিশ কনসালের বাড়িতেই গিয়েছিল। আমি ভিসা নিয়ে আর কোথাও দাঁড়ালাম না একদম চলে আসলাম বৃটিশ কনসালের বাড়ীতে। কনসাল আমাকে জানতেন এবং আমি উপস্থিত হওয়ামাত্রই ডেকে পাঠালেন। কথা প্রসংগে বললেন আপনি দয়া করে দেড়শত ডলার পেয়েছেন বলে একখানা রসিদ দিন আমি আপনাকে পঁচিশ ডলার দিচ্ছি। আমি তৎক্ষণাৎ দেড়শত ডলার পেয়েছি বলে এক খানা রসিদ দিলাম এবং মাত্র পঁচিশ ডলার পেলাম। এই টাকাটা পাবার একমাত্র কারণ হল, আমার সম্বন্ধে অনেকেই নানা রকমের রিপোর্ট দিয়েছিল। প্রত্যেকেই সেজন্য কিছু পেয়েছিল, আমিইবা তা হতে বাদ যাই কেন এই ভেবে কনসাল অন্যান্য রিপোর্টারদের রসিদ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু আমার রসিদ খানাই রেখে দিলেন। বুঝলাম পর্যটকের দেওয়া টাকার রসিদের মূল্য অন্যান্য সকলের রসিদের মূল্য হতে বেশি।

তখনকার দিনের সাংহাই এক আজব শহর ছিল। একটা মরা গরুর চারদিকে শকুনির দল যেমন করে ঘিরে দাঁড়ায় একটা নবাগত ইণ্ডিয়ানের চারিদিকেও ঠিক তেমনি শকুনিদের মতই এক রকম জীব এসে ঘিরে দাঁড়াত। এসব শকুনীদের নানা দেশের কনসাল পোষণ করতেন।

আমার ইচ্ছা ছিল ফিলিপাইন দ্বীপের রাষ্ট্রকেন্দ্র মেনিলা হতে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ দেখে সিংগাপুর ফিরে আসি, তাই সাংহাই হতেই সুরবায়ার ভিসা

নিবার চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয়েছিল। একদিন সেই মতলব পূর্ণ করতে ডাচ্ কনসালের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ডাচ্‌রা মিষ্টভাষী এবং মিচকী শয়তান। যদিও ডাচ কনসাল আমার সংগে হেসেই কথা বললেন তবুও ভিসা দেবার বেলা তার কলম আর উঠল না। কনসালের ঘর হতে বার হয়ে দেখি আমার জন্য একজন ভারতীয় অপেক্ষা করছে। তাকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হলাম। আমি ভারতীয়টির দিকে থুথু নিক্ষেপ করে সিনেমা দেখবার জন্য সিনেমা ঘরে চলে গেলাম।

গুপ্ত পুলিশের কাজ করতে কেউ কারুকে বাধ্য করেনা, তবে কেন বিদেশের ভারতবাসী এহেন কাজে অগ্রসর হয় সে কথার জবাব আমার নিজের মাঝেই পেয়েছিলাম। অর্থাভাব হল প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ হল জাতীয় ভাবের অভাব। আমাদের দেশে জাতীয় ভাবের জাগরণ হয়েছে বৃটিশদের আগমনের বহু পরে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সংগে। জাতীয় ভাব না গড়ে উঠার জন্যে বিদেশী মোটেই দায়ী নয়, দায়ী আমাদের ধর্ম এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মাবলী। এখন ও মানুষের তৈরী করা ধর্ম আমাদের পায়ে যেমন কুড়াল মারছে, আমাদের সমাজ আমাদের যেমন করে পংগু করে রাখছে তেমনটি অন্যত্র দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড এতই নরম যে যখন কেউ এতে মামুলী আঘাত করবে তখনই তা ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। খালিগায়ে বসে পৈতা জড়িয়ে বাজে প্রবন্ধ লিখার মূল্য এখনই কমতে আরম্ভ হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। যদি আমার কথার প্রতিবাদ কেউ করেন এবং বলেন এখনও আমাদের পুরাতন সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তরে আমি বলব এটা বৃটিশের ভারত-বাসীর প্রতি একটা অনুগ্রহ মাত্র।

কয়েক দিনের মাঝেই টিকেট কেনায় কাজে লেগে গেলাম। তথায়ও নানারূপ প্রতিবন্ধক এসে উঁকি মারতে লাগল। এরূপ বিপদ উঁকি মেরে

দেখবার প্রধান কারণ ছিল আমার জাত ভাই ভারতবাসীই। কোনও ইংলিশ আমার পেছন ঘুরছিল না। আমি কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কার সংগে কথা বলছি, এসব লোকই সকল সময় দেখছিল।

আমেরিকার জাহাজ চড়ে ফিলিপাইন যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম, সেজন্য আমেরিকার জাহাজ কোম্পানির অপিসে যাওয়া আসাও করতে হয়েছিল। আমেরিকার জাহাজ কোম্পানির একজন গণ্যমান্য লোক আমাকে ডেকে বললেন আপনার বিরুদ্ধে হিন্দুরা উঠে পড়ে লেগেছে। আপনার সম্বন্ধে স্থানীয় বৃটিশ পুলিশ অপিসে এবং বৃটিশ কনসালের সংগে কথা বলেছি, তারা কেউ আপনার বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি অথচ আপনার দেশের লোক কেন যে আমাদের কাছে পর্যন্ত রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, সাম্রাজ্যবাদীদের পলিসিই হল "Keep the dogs busy", এদের ত আর কোন কাজ নাই। সেজন্যই তারা আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেদিনই আমার টিকেট কেনা হয়ে গিয়েছিল, আর সাত দিন পরই আমাকে সাংহাই পরিত্যাগ করার দিন ঠিক হল। সাতদিন বসে থাকা চলে না, আমি সাংহাই শহরটা আবার দেখতে লাগলাম। দেখার পথ সুগম ছিল। যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানেই আমার সংগে একজন লোক সর্ব্বদা থাকত। চীনা গোয়েন্দা আমার পেছন নিতনা কারণ ইনস্পেক্টারদের যদি নিজের পয়সা খরচ করে গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে হয় তবে আর কিছুই থাকে না। সাংহাই সম্বন্ধে 'মরণ বিজয়ী চীনে' অনেক কথাই বলা হয়েছে সেজন্য এখানে আর নতুন করে সাংহাই সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না।

চীন হতে বিদায়

বিদায় সাংহাই। তোমার বুকের উপর অনেক দিন বেড়িয়ে গেলাম। সাংহাইয়ের কথা জীবন থাকতে ভুলতে পারব না। ইউরোপের সব জাত মিলে, চীনের মজুরকে খাটিয়ে, ইউরোপ হতে নানারূপ কল কব্জা এনে এই বৃহৎ নগরকে প্রস্তুত করেছে। ইউরোপের পুঁজিবাদীরা ভেবেছিল অনেক বৎসর তারা এখানে বসে চীনের রক্ত চুষতে পারবে, কিন্তু তা হয়ে উঠবে না, মানুষ উন্নতি করে যাচ্ছে। চীনারাও উন্নতি করতে চেষ্টা করছে সেজন্য চীন সভ্যতা কতকটা সাহায্য করেছে, আর বাকিটা করছে বৈদেশিক অত্যাচার। আমাদের দেশের কবি গেয়েছিলেন "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।" আমরা কবির কবিতাই প্রশংসা করেছি, কিন্তু কবি কোন্ দুঃখে সেই কথা বলেছিলেন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি। চীনের লোক আমাদের কবির কথা বুঝতে পেরেছে তাই আত্মগোপন করে শুধু কাজই করে যাচ্ছে। চীনের কি সবাই কর্মী? তা নয়। কাজ করে কয়েকজন মাত্র, তার সুফল ভোগ করবে সকলেই।

বিদায়ের বেলা বেশি কিছু ভাবতে সক্ষম হইনি, শুধু যাতে সত্বর জাহাজে উঠতে পারি তাই চিন্তা করেছিলাম। জাহাজে উঠে সাইকেলটি ভাল করে কেবিনে রেখে একটু বিশ্রাম করার পর নীচে গিয়ে একটু খাবার খেয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সাংহাই নদীবক্ষের ছোটবড় নানা রকমের বাণিজ্য-পোতের দৃশ্য দেখতেছিলাম। সাংহাই পূর্ব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। কত জাহাজ আসছে এবং যাচ্ছে পোর্ট অফিসারদের কাছ থেকে যদি জেনে আসতে পারতাম তবে বেশ ভাল হত নিশ্চয়ই, কিন্তু তা করিনি বলে এখন বড়ই দুঃখ হয়। আমার মনে হয় লণ্ডন, নিউইয়র্ক, লিভারপুল সাউথহামটন,

সেন্‌ফ্রান্‌সিসকো এই কয়টি বন্দরের পরই সাংহাইকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সাংহাইয়ের দৃশ্য দেখে কেবিনে একটু বিশ্রাম করলাম। এরই মাঝে জাহাজ নড়ে উঠল। আমি আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে সক্ষম হলাম না, আবার বাইরে এসে নদীতীরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

অত্যাচারিত চীনারা অবনত মস্তকে সামপান বেয়ে নদীতে চলাফিরা করছে। বড় বড় জাহাজ দেখে তাদের আনন্দ হচ্ছে তাই দাঁত বের করে হাসছে। কিন্তু সে হাসিতে মাধুর্য ছিল না। মরবার পূর্বে বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন করে হাসে, ওদের হাসি সেই ধরণের। এরাও না খেয়ে অধিক পরিশ্রমের ফলে অসময়ে মরবে। তবে এর মাঝেও একটি সুসংবাদ আছে, সেই সুসংবাদটি হল চীনারা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না। তারা বলে "লোকটা বেশীদিন বাঁচতে পারল না, না খেতে পাওয়াই তার একমাত্র কারণ।" চীন যে আজ লড়ছে, জাপানকে রুখছে, তার পেছনে রয়েছে তাদের জাতীয় শিক্ষা। তারা কখনও "থিনকং" "Thin kong" অর্থাৎ ভগবানের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেয় না। বৌদ্ধ মতে ভগবান বলে কিছুই নাই, কন্‌ফিউসস মতে ভগবান বলে যে কিছু আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। যেখানে বাজে কথার আড়ম্বর নাই সেখানেই লোক কাজ করতে সক্ষম হয়।

জাহাজ ধীরে চলতে লাগল। জাহাজে কয়েক জাতের পাসেন্‌জার। জাপানী, চীনা, ফিলিপাইনো, আমেরিকান, এবং কয়েকজন ইউরোপিয়ান। প্রায় পাসেন্‌জারই ডেকে এসে নদীতীরবর্তী দৃশ্য দেখছিল। অনেকে যুদ্ধের স্মৃতি অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপ দেখে নানা মন্তব্য করছিল। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিলাম, সবই বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু মুখ খুলে একটি কথাও বলতে পারিনি। কি আমার বলার আছে? আমাদের দেশে দেখেছি,

যখন লোক কোর্টে যায় তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যাতে নিজের স্বার্থ বজায় থাকে তাই করে, সত্য মিথ্যা মতবাদ এসবের কোন ধার ধারে না। এই যদি হয় একজনের সংগে অপর আর একজনের, সেই অনুপাতে যখন একটা জাতের সংগে অন্য একটা জাতের লড়াই সুরু হয় স্বার্থ নিয়ে, তখন কি না ঘটতে পারে? তখন সবই সম্ভব। এত শুধু ধ্বংসস্তূপ, এই ধ্বংসের পেছনে আরও কত কিছু রয়েছে তার অন্ত নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে নানা চিন্তা করে কেবিনে এসে স্থান নিলাম।

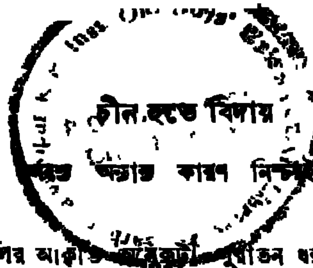
এটা এমেরিকার জাহাজ। এই জাহাজে এমন কোন লোক নাই যে আমার সংগে কোনরূপ বাদ সাধতে পারবে। দেশের লোক একটিও ছিল না। জাহাজ যখন চীন সাগরে আসল তখন মৃদুমন্দ দুলতে লাগল। সেই দোলার সংগে চক্ষু বুজে গেল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। চারটার সময় বয় এসে কেবিনেই খাবার দিয়ে গেল। কাল্লুরবার অর্থাৎ অশ্বেতকায়দের সংগে বসে শ্বেতকায়দের খাওয়াটা অপমানজনক একথাটা বুঝতে পূর্বে পারিনি, মনে করেছিলাম হয়ত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কেবিনে বসেই খেতে হয়। খাবার পর ডেকে বেড়াতে লাগলাম। দু একজন চীনা তাদের নিজের দেশের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলছিল। সে কথা বুঝবার সুযোগ হয়েছিল চীন দেশে অনেক দিন থাকার ফলেই। কয়েকজন জাপানী যাত্রীও ছিল। তারা ইংলিশ ধরণে গাল ফুলিয়ে কি দেখিতেছিল। আমি তাদের কাছে যাইনি ত রাও আমার দিকে আসেনি। এদিকে বৃটিশ যাত্রী বড় দেখতে পাওয়া যায় না। এদিকে যারাই বৃটিশ যাত্রী, তারা হয় ব্যবসায়ী নয় সরকারী কর্মচারী। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা অনেক সময় বৃটিশ রাজকর্মচারীদের অবজ্ঞাই করে থাকে। যারা তাদের রাজকর্মচারীদের হিসাব করে না তারা অন্যকে কেন পরওয়া করবে? একজন সেই ধরণের লোক জাহাজে ছিলেন। আমেরিকানরা তারই কথা বলত এবং মনে মনে রাগত, মুখে কিন্ত

কিছুই বলবার তাদের অধিকার ছিল না। আমি তারই আভাস কিছু পেতাম বলেই কথাটা এখানে বলতে হল।

কতকগুলি চীনা যুবক আমেরিকা হতে সোজা ফিলিপাইন যাচ্ছিল। পোষাক, কথাবলার ধরণ, চলবার কায়দা, এবং তাদের আমেরিকান অফিসারদের সংগে ব্যবহার দেখে মনে হ'ত, এরা বড়ই সাহসী এবং যদি দরকার হয় তবে যে কোন মহৎ কাজ তাদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছিলাম তারা কখনও কোন জাপানীর সংগে বসে একত্রে খেত না, জাপানীদের সংগে কথা বলত না, জাপানীদের এড়িয়ে যাবার জন্যই চেষ্টা করত।

আমি ছিলাম একা, জাহাজে সম্পূর্ণ একা। কথা বলার মত লোক একটিও পেলাম না। একটা দিন এমনি করে কেটে যাবার পর দ্বিতীয় দিন ইচ্ছা হল একটু চেষ্টা করে দেখা যাক আমেরিকাবাসী চীনাদের সংগে কথা বলতে পারা যায় কিনা। ওদের সংগে একটু ঘেঁষতেই ওরা আমার সংগে কথা বলতে শুরু করল কিন্তু আন্তরিকতা তাতে মোটেই ছিল না। আমাকে নীরবেই কাটাতে হল। সংগের বইগুলিই হল আমার একমাত্র সাথী।

আমাদের জাহাজ চীন উপকূল ধরে চলছিল। আমার কোন কাজ না থাকায় ডেকে বসেই সময় কাটাতে হ'ত। ডেকে বসে অনেক জিনিষ দেখতে পেতাম। বড় বড় জোয়াংকো, জাংক, এমন কি সামপান পর্যন্ত পাল খাটিয়ে যখন আমাদের জাহাজের কাছ দিয়ে নির্ভয়ে চলে যেতে দেখতাম তখন অনেক পুরাতন এবং সাময়িক কথা মনের কোণে এমনি এসে জমাট হ'ত। এক একটি চিন্তাকে আবার নিজের মনের মাঝেই বিশ্লেষণ করতে হ'ত। চীনা মাঝিরা সমুদ্রে নির্ভয়ে চলে, তা তাদের বর্তমান এবং অতীত দেখে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু এর পরও চীনাদের একটি বিশেষ গুণ আছে যার জন্য বোধ হয় ইউরোপীয় এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে



দখল করেন নি। কিন্তু অন্যান্য কারণ নিশ্চয়ই আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তোয়াকোগুলির আকৃতি অনেকটা পুরাতন ধরণের জাহাজের মতন। তোয়াকো নিয়ে জাহাজ আক্রমণ করাটা আরবগণ কোনও এক সময়ে করত সে কথা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, কিন্তু বর্তমানে কোন বড় নৌকা ভারত মহাসাগরে জাহাজকে আক্রমণ করেছে বলে শুনা যায় না। চীন সাগরে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে কিন্তু তা প্রায়ই ঘটে এবং সে জন্যই প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলভাগে যে সকল ছোট জাহাজ চলাফেরা করে তার মাঝে এমনি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে যাতে করে যে দিকেই জাহাজ আক্রান্ত হউক, অফিসারগণ এবং জাহাজের মূল্যবান জিনিস কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রক্ষা পাবেই। জলদস্যু যখনই খালাসীদের এবং আগুণওয়ালাদের কাবু করতে পারে তখনই অফিসারদেরও বাগে আনতে সমর্থ হয়।

যে জাতের লোক এখনও সাহসের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর ঘুরে বেড়ায় সে জাতের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা সমূহ কর্তব্য। আমার মত লোক সেরূপ সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। ভবিষ্যতে যারা চীন দেশে যাবেন এবং চীনাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বই লেখবেন আমি তাদের উপরই এই গবেষণার ভার অর্পণ করলাম। তবে আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়, কনফিউসন্ মতবাদ এবং বৌদ্ধ মতবাদ চীনাদের সাহসী হতে অনেক সাহায্য করেছে। আমরা বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যাই ভাবি না কেন চীনারা বৌদ্ধের অহিংসা ধর্মকে যে রূপ দিয়েছে তা বাস্তবিকই প্রণিধান যোগ্য। চীনারা খেতে বসে যে কোন ধর্মের যে কোন বর্ণের লোককে একই টেবিলে নিয়ে বসে খেতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। এখানেই তাদের অহিংসা। কনফিউসন্ বলেছেন, এমন কোন কাজ করো না যাতে করে অন্যের ক্ষতি হয়। কিন্তু যারা অন্যের ক্ষতি করে মজা

করছে তাদের কি শাস্তি হবে তার কথা বলে যান নি। এতে চীনাদের বেশ সুবিধা হয়েছে। তারা জানে ধনীলোক অন্যায় এবং অপকর্ম না করে ধনী হতে পারে না, সেই ধনীদের কাছ হতে যদি কিছু নিয়ে নেওয়া যায় তবে দোষের কিছুই নয়। চীনারা চুরি করে মিথ্যাকথা বলা,ছেঁচড়ামি করা এসব মোটেই পছন্দ করে না। একথা চীনের শত্রুও বলবে। চীনারা ডাকাতি করাকে কাজের মাঝেই গণ্য করে। ডাকাতি করা কাজটি সহজসাধ্য নয় এবং অনেক সময় মৃত্যু তাতে বরণ করে নিতে হয়ই। মরণ যাতে বাঁচবার সাহায্য করে এবং সমাজ সেই মরণকে অপমৃত্যুও বলে না, নরকে যাবার ভয়ও দেখায় না, সেই সমাজ চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেকটা সহায়তা করেছে যদি বলা যায় তবে কোন দোষ হবে না বলেই মনে হয়।

চতুর্থ দিন সকালবেলা আমাদের জাহাজ চীন সমুদ্রতীর ঘেঁষেই যাচ্ছিল। চীনের সমুদ্রতীরের আশেপাশে ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপগুলিতে লোক নাই। হয়ত একদিন তথায় লোক ছিল, কিন্তু সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। সেই পুরানো কথা আমার বলা উচিত নয়। কারণ, এই দ্বীপগুলির আশেপাশে এখনও অনেক যাযাবর জাতের গমনাগমন আছে তবে তারা তথায় থাকতে সাহস করে না; পৃথিবীর সর্বত্র এক ধরণের সামুদ্রিক যাযাবর জাতের লোক দেখা যায়. তারা একস্থান হতে অন্যস্থানে নৌকা বেয়ে গিয়ে কয়েকদিন নতুন স্থানে থাকতে ভালবাসে। সভ্য চীনারা এদের একরূপ শেষ করে এনেছে বললে দোষ হয় না। এদের বংশধর আর থাকবে না। তাদের জন্য আমি চোখের জল ফেলতে রাজি নই। যারা পুঁজিবাদী এবং যারা কৃষ্টির কথা বলে অপরকে অন্ধকারেই রাখতে চায় তারাই চীনা বেদেদের কথা বলে চোখের জল ফেলুক।

পঞ্চম দিন সকালবেলা আমাদের জাহাজ হংকং এসে দাঁড়াল। অনেক চীনা হংকংএ নেমে গেল। আমি হংকং বেড়াতে গেলাম এবং অনেক সংবাদ-

পত্রের সম্পাদকদের সংগে দেখা করলাম। মদ্‌ণিংপোষ্ট নামক সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক শুধু কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন। সেই প্রশ্নগুলি শুনেই আমার ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই বুঝি আমার ভ্রমণ এখানেই খতম হয়। সম্পাদক কিন্তু অন্য ধরণেই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এখন সেই প্রশ্ন এবং তার উত্তর গুলি সংক্ষেপে বলে ফেললেই আমি দায় হতে মুক্ত।

মিঃ মাও সু তানকে দেখেছেন?

হাঁ, দেখা হয়েছে।

তিনি টিকে থাকতে পারবেন বলে মনে নয় কি?

তাঁর প্রতি লোকের সহানুভূতি আছে বলেই মনে হয়।

মিঃ মাও এর কাজে চীনের ফ্যাসিষ্ট সরকারের ক্ষতি হবে বলে কি মিঃ মাওএর ধারণা হয় না?

আমার মনে হয় মিঃ মাও একজন বিদ্রোহী, তিনি সামাজিক, আর্থিক এবং নৈতিক বিপ্লব সমাজে এনেছেন এবং ভবিষ্যতে সমগ্র চীনে তার প্রভাব আরও বাড়বে।

পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে আমার এবং সম্পাদক মহাশয়ের সংগে যে কথা হয়েছিল তা একটু বন্ধ রেখে চীনের কমিউনিষ্ট দলের কথা একটু বলছি। মিঃ মাও সুতনকে কমিউনিষ্ট দল হতে তিনটি কারণে বিতাড়িত করা হয়, সেই তিনটি কারণএর প্রথমটি হল বড়ই গুরুতর। কমিউনিষ্ট দলের প্রেসিডেন্ট বর্তমান মস্কো নিউজের সম্পাদকের মারফতে মিঃ মাও সুতানকে জানান যে যদি মিঃ মাও সুতন এ সময়ে বিদ্রোহ করেন তবে চীন দেশ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা টুকরো টুকরো করে ভাগকরে নিবে; মিঃ মাও এসব কথা অগ্রাহ্য করেই বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেন এবং সে জন্যই তাঁকে চীনের সেন্ট্রাল কমিউনিষ্ট দল হতে বিতাড়িত করা হয়। অন্য আরও

দুটি কারণ ছিল তা মামুলী। যদিও তা মামুলী তবুও আমার কাছে সেই দুটি কথা বড় বলেই মনে হয়। ধর্মের দিক দিয়ে একদম নিরপেক্ষ থাকা এবং সামাজিক নিয়ম বদলী করা। আবার কথা আরম্ভ হল।

চা-দিন সোভিয়েট কেমন দেখলেন ?

আমার কাছে বেশ ভাল লাগল তবে যা এখন হচ্ছে তা প্রাথমিক কাজ, ভবিষ্যতে বোধহয় আরও উন্নতি হবে।

সৈনিকদের স্বভাব চরিত্র কিরূপ দেখলেন ?

চা-দিন সোভিয়েটে সৈনিক নাই, সবাই বন্দুকধারী ছাত্র। সবাই শিক্ষিত। সকলেই নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান এবং সবাই স্বদেশ প্রেমিক। এরপর আর বেশি কথা বল না, তবে আমি এরূপ ইংগিত পেয়েছিলাম এবং এরূপ ইংগিত দিয়েও ছিলাম যে এসব কথা কারো কাছে বলব না। সেই কথাগুলি আজ পর্যন্ত কারো কাছে বলিনি। এখন এসব কথা বললে কোন দোষ নাই কারণ সোভিয়েট রুশ আপাতত সাম্রাজ্যবাদীদের শত্রু নয়, লালচীন আমেরিকার সাহায্যই চাইছে।

সম্পাদক মহাশয়ের থেকে বিদায় নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সংগে সাক্ষাৎ করব ভেবে পথে বের হয়েছি এমনি সময় পেছন থেকে একজন চীনা যুবক আমার কোটে টান দিল। পেছনে চেয়ে দেখি আমার পরিচিত সেই মুখখানি। মুখখানিতে হাসি, ভরা কিন্তু তাতে মরণের একটা ছাপ দেওয়া রয়েছে। চীনাদের শরীরে মরণের ছাপ জন্ম হতেই থাকে বলে চীনে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। পরিচিত মুখখানিকে সম্বোধন করে বললাম, "আপনাকে জীবিত দেখব ভাবিনি, সুখের বিষয় আপনি এখনও বেঁচে আছেন।" তারপরই জিজ্ঞাসা করলাম, হংকং কি করে এসেছেন। তাঁর হংকং আসার ভ্রমণ কথা অপূর্ব এবং তা শুনে সুখী হয়েছিলাম, কিন্তু এই জাতের মাঝে মরণের পিপাসা এমনি করে এত সহজে

কি করে জাগল তাই অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলাম। জাপানীদের মাঝে মরণের পিপাসা জেগেছিল উৎকট দেশপ্রেমে, আর এদের মাঝে দেশ প্রেম জেগেছে উৎকট বিশ্বপ্রেমে। যুবককে অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পিয়র হতে জাহাজে উঠলাম।

এরই মাঝে একটি শিখ আমারই কেবিনে স্থান নিয়েছে। আমাকে দেখেই লোকটার শান্তি ভংগ হল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খাবার খেয়ে ফের সহরে আসলাম এবং আমার পরিচিত পাঠানের সংগে দেখা করলাম। মরণ বিজয়ী চীনে এই পাঠানের কথা অনেক বলা হয়েছে সেইজন্যই এখানে পাঠানের কথা বলা হল না তারপর দেখা হল অ্যানির সংগে। সেও জাতে পাঠান। সে আমাকে একজন ইন্দোচীন (পিতা পাঠান, মাতা চীনা) হংকং আমার সংবাদ দিল। যে মালয় এবং শ্যাম দেশের কতক অংশ ভ্রমণ করে হংকং এসেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বই লেখতে সক্ষম হয়নি। তখন আমিও কোন বই লিখিনি, তাই বিষয়টা সংক্ষেপ করার জন্য অন্য কথার অবতারণা করলাম। মনে মনে ঠিক করলাম বই লেখা আমার অবশ্য কর্তব্য হবে।

বার বারই বলেছি আমার সাহিত্যে জ্ঞান খুবই কম তাই এখানে নতুন করে আর কথাটা বলে লাভ নাই, কিন্তু আজ আমার লেখাপড়ার দরকার অনুভব হয়েছে বলেই মনে হল। অ্যানি বার বার আমাকে বলতে লাগল আমি যেন ইংলিশ ভাষায় আমার ভ্রমণ কাহিনী লিখি এবং বিশ্বব্যাপিয়া তার প্রচার করি। তাকে বলেছিলাম, তারই চেষ্টা করব। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেদিকে অগ্রসর হতে পারিনি বলে বড়ই দুঃখিত হয়েছিলাম আজ এসব কথা নতুন হয়ে আমার মনে জেগে উঠছে, তার একমাত্র কারণ আজ পর্যন্ত আমি আমার কাজে কৃতকার্য হইনি। ভ্রমণ অনেকেই করে কিন্তু ভ্রমণকাহিনী অতি অল্প লোকই লেখে।

রাত চারটা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লাইনের জাহাজ হঠাৎ সিংগা

ফুকে হংকংকে জানিয়ে দিল, সে এখন মেনিলার দিকে রওয়ানা হয়েছে। আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার ঘুম ভাংগল। উঠে গিয়ে রাত্রের অন্ধকারে ফের হংকংএর বিজলী বাতির দ্বারা খচিত নক্ষত্ররাজির দৃশ্য দেখে এলাম। মনে হল এদৃশ্য দেখার সুযোগ যেন আরও হয়। জাহাজ ধীরে বন্দর ছেড়ে 'বাহির দরিয়ায়' আসল। ক্রমেই আকাশ পরিষ্কার হতে লাগল। পূর্বদিকে সূর্যের রক্তিমাভা দেখবার জন্ম প্রায় লোকই বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে আজ দেখলাম। এই দৃশ্য দেখে কত লেখক কত লেখাই লেখেন তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আমার কাছে এ দৃশ্য মোটেই সুন্দর লাগল না। আমার মনে হল প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসে কম্পিত ধানের অগ্রভাগ ভেদ করে অসীম মাঠের বুকে'খে প্রভাতী সূর্য স্বগ্রামে দেখেছি তা এর চেয়ে আরও সুন্দর। আমাদের দেশের ভাদ্র মাসের প্রভাতী সূর্যের উদয় দেখে কেউ আনন্দ পেয়েছেন কিনা জানি না তবে আমি সেই সূর্যের সৌন্দর্য অনুভব করতে পেরেছি আর এটা পারছি না। তার একমাত্র কারণ হল সময় এবং স্থানের পার্থক্য। সেই ছোটবেলায় ভাবতাম আমাদের গ্রাম আমাদেরই, গ্রামের মাঝে কোনরূপ অশান্তি ছিল না। মন ছোট গ্রামের কথায়ই মেতে থাকত। আর আজ পৃথিবী ব্যাপিয়া মনের বিস্তার হয়েছে। তখনকার দিনের শান্তিময় গ্রামের প্রত্যেকটি অংশে পরাধীনতার অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জলছে, জাহাজে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যই যেন বেশির ভাগ চোখে ভাসছিল। ছোট বেলার মন আর এখনের মনে অনেক প্রভেদ, তাই বোধ হয় কোথাও শান্তি পাচ্ছিলাম না। প্রভাতী সূর্য দেখা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগল না। কেবিনে ফিরে এসে দেখি আমারই টুথ-ব্রাসটা দিয়ে শিখ লোকটি বেশ আরাম করে দাঁত মাজছে। দৃশ্যটা দেখেই বেশ একটা ঘৃণা হল। ঘৃণার ভাব মনেতে লুকিয়ে রেখে লোকটাকে বললাম, অপরের টুথ-ব্রাস ব্যবহার না করতে তোমাকে আজ পর্যন্ত কি কেউ বলেনি? লোকটি

আমার কথা শুনে কোন কথাই বললনা, শুধু ব্রাসটা সাগর জলে ফেলে দিয়ে কেবিন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। লোকটির প্রত্যেকটি কাজেই সংকোচের ভাব ছিল। তার কারণ খুঁজে যখন জানলাম লোকটি মেনিলাতে দ্বারওয়ানের কাজ করে। হয়ত একদিন আমার কাছেও সেরূপ চাকরির জন্ম আসতে হয় সেই ভেবেই লোকটা আমার সামনে সাহস করে কথা বলতে পারছিল না।

চতুর্থদিন সকালবেলা জাহাজ মেনিলা বন্দরের কাছে এল। বাইরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। মেনিলা বন্দর হংকংএর মত সুন্দর নয়। সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। ডান দিকে আমেরিকার পোতাশ্রয়, বাঁদিকে জেটি। জাহাজ জেটিতে লাগবার পূর্বেই ডাক্তার এসে হাজির হলেন। ফিলিপাইনো, জাপানী, চীনা এবং আমরা দুর্জন ভারতবাসী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম। ফিলিপাইনোগুলি ডাক্তারী পরীক্ষাকে একদম অবহেলা করছিল, জাপানীগুলি দাম্ভিকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, চীনারা কাঁপছিল, আমার সাথের শিখ ভায়া কি ভাবে সেলাম দিলে ভাল হবে তারই মক্স করছিল আর আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করছিলাম। জাপানীদের সর্বপ্রথম ডাক্তারী হল। ডাক্তার সর্বপ্রথমই গুডমর্নিং বলে জাপানীদের সম্বোধন করা মাত্র জাপানীরা মাথা নত করে ডাক্তারকে নমস্কার জানাল। তারপর শুরু হল চীনাদের বুক পরীক্ষা। তাতে কেউ পাশ হল আর কেউ ফেল করে বোকা হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ্য করে দেখলাম প্রত্যেকটি জাপানী ইউরোপীয় পোষাক পরে দাঁড়িয়েছিল আর চীনাদের মাঝে কেউ ছাতার কালো কাপড়ের পাজামা পরে আর কেউবা ইউরোপীয় পোষাকে ভূষিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাপানীদের মাঝে ছিল 'ইউনিফরমিটি' আর চীনাদের মাঝে ছিল পৃথক পৃথক ভাগ। জাপানীরা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী আর চীনারা ছিল লোভী এবং কাপুরুষ। লোভীরাই 'ইউনিফরমিটি' মেনে চলতে সক্ষম হয় না।

চীনাদের পরীক্ষা হবার পর ডাক্তার আমাদের কাছে আসলেন। শিখ লোকটি পল্টনী কায়দায় সেলাম করল। আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তার আমাদের মোটেই ঘাটালেন না, তবে কাষ্টম অফিসারের 'করুণ' দৃষ্টি হতে আমি বাদ যাইনি। বুঝলাম নামবার বেলা একটা হট্টগোল হবেই এবং সেজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। জাহাজ জেটিতে ভিড়ল। সকল যাত্রীই চলে গেল শুধু আমিই বসে রইলাম। একজন সিন্ধি এসে বললেন তিনি আমার জন্য দুহাজার ডলারের জামিন হবেন জামিন হবার জন্য তিনি কতকগুলি সর্ত দিয়েছিলেন। সর্তগুলি ভাল ছিল না সেজন্য তাতে রাজি হলাম না।

বেলা তখন তিনটা। জাহাজের এক কোণে দাঁড়িয়ে পাখীর মাছধরা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম দরিদ্র এবং পরাধীন হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া কত পাপের। ঐ মাছগুলিকে পাখী ধরে খাচ্ছে। পাখীও স্বাধীন আর মাছও স্বাধীন। জলেতে মাছ ইচ্ছামত বেড়াতে পারে, আকাশে পাখী ইচ্ছা মতে উড়তে পারে, কিন্তু দরিদ্র মানুষ ইচ্ছামত কোথাও যেতে পারে না। মাছের খেলা এবং মাছের মৃত্যু যখন বেশ মন দিয়ে দেখছিলাম তখন একজন ফিলিপাইনো অফিসার এসে বললেন যদি আমি আমার পাসপোর্ট তাদের অফিসে জমা দেই তবে তিন মাসের জন্য তিনি আমাকে ফিলিপাইন থাকতে দিবেন। আমি তার কথায় রাজি হলাম কিন্তু মনে হতে লাগল স্বাধীনভাবে নামতে পারলাম না। অনেকে হয়ত বলবেন এতে দুঃখ করার কি আছে? আমি বলব এতে দুঃখ করার অনেক কিছু আছে। যদি কেউ জানে এই পৃথিবীতে তাকে এর বেশি সময় থাকতে দেওয়া হবে. না তখন তার মনের ভাব কেমন হয়? আমারেও মনের ভাব তেমনি হয়েছিল। ফিলিপাইনে আমার থাকার সময় মাত্র নব্বই দিন। তারপরই আমাকে চলে যেতে হবে। অফিসে গিয়ে পাসপোর্টখানা জমা দিয়ে সদর পথে বের হলাম।

মেনিলা

মেনিলাতে আমেরিকার ছাপ পড়েছে। মেনিলার প্রত্যেকটি পথ সোজা। যত আঁকাবাঁকা পথ ছিল সবই ভেংগে ফেলা হয়েছে। পথ চলার সময় এক স্থানে দেখলাম সিগারেট তৈরী হচ্ছে। সিগারেট তৈরী কি করে হয় তাই দেখলাম অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। তারপর থাকবার জন্য একটি হোটেলে গেলাম। হোটেলের চার্জ এখানে আমার কাছে বেশী বলেই মনে হল। দুই পেসো অর্থাৎ আমাদের দেশের চার টাকার কমে একটি রুম পাওয়া যায় না। এখানে আমি ভিক্ষা পাব কি পাব না এটাই ছিল চিন্তার বিষয়, তাই হোটেলে না থেকে স্থানীয় গুরুদ্বারে থাকতে গেলাম এবং থাকবার স্থানও পেলাম, কিন্তু এতে আমার সমূহ ক্ষতি হয়েছিল।

লোকে লেকচার দিয়ে কত কথা বুঝাতে চেষ্টা করে এবং সেই লেকচার লোকে বুঝেও কিন্তু লেকচারের কথা মত কয় জন কাজ করে? শিখদের গুরুদ্বারে এসে লেকচার শুনলাম কিন্তু দেখলাম চোখে চোখে ইসারা চলছে, মনে মনে কথা-কয় কথা মস্ক করা হচ্ছে রিপোর্ট কোথাও পাঠান হবে বলে। রিপোর্ট কে নিবে? এটাত বৃটিশের রাজ্য নয়, এটা হল এমেরিকার কলনী, তবে এখানে কেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ইনফরমার হয়ে ভারতবাসীর পেছনে ভারতবাসীই ঘুরে? বুঝলাম আমারও পেছনে লোক লেগেছে। তবে সুখের বিষয় এখানে ভারতবাসী গোপনীয় পোশাক পরলেও তাদের সর্বত্রই চেনা যায়। তখনকার দিনে আমার চোখে ছিল প্রখর তেজ, মগজে ছিল তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারত না। কয়েকজন ফিলিপাইনো হয়ে গেল আমার বন্ধু, আর মিঃ রুজভেল্ট আমাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে করমর্দনও করলেন, এতে পাগলা কুকুর স্বদেশবাসী ভাইদের

কাজে অনেকটা ব্যাঘাত হল। এই রুজভেল্ট হলেন ফিলিপাইন দ্বীপের গভর্ণর। লোকটি বেশ ভদ্র এবং গভর্ণর যেমন হয় তেমনি ধারার লোক।

পায়ে হেঁটে দোকানে দোকানে গিয়ে তিনি সওদা কিনেন এবং আমারই সামনে একদিন বাগাও (Bagio) সহরের এক ভারতীয় সিল্কের দোকান হতে একখানা দেওয়াল পন্‌জি চেয়ে নেন। এটা দেখে আমি অবাক হলাম না। কারণ, ফিলিপাইন দ্বীপের গভর্ণর বাহাদুর মাত্র মিষ্টার, তাঁকে সাধারণ লোকের মত থাকতে হয়। তাঁর সংগে দেখা করতে হলে নামের কার্ডের দরকার হয় না। যা ইচ্ছা বলে আসে, সম্ভবই বোধ হয় কেউ তাঁর বাড়ীতে দর্শন প্রার্থী হয় না।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের চালচলন, কার্যকলাপ রাতদিন তফাৎ। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী যার রক্ত শুষবে তাকে লেখাপড়া শেখায়, ভালভাবে রাখে, বাড়ীঘর তাদেরই মত করে গঠন করে দেয় এবং আমেরিকার স্টেটাসে উঠাতে প্রাণপণ সাহায্য করে। চূণ কালি মেখে মুখ ফুলিয়ে ময়ূর সিংহাসনে বসে, চারদিকে নরক কুণ্ডে মানুষ বিষ্ঠার কীটের মত প্রখর সূর্য্য কিরণে পতিত হওয়া অর্থাৎ অভাবের অনটনে ছটফট করে মরতে দেখা পছন্দ করে না। আমেরিকান জাতটা যেমন রাতারাতি ধনী হতে চায়, তেমনি করে তারা দেখতে চায় তাদের কলনীর লোকও ধনী হউক এবং যতদূর সম্ভব আমেরিকার সংগে আর্থিক সম্বন্ধের আওতায় থাকুক। বৈদেশিক দূতের বদলাবদলী এবং আভ্যন্তরিক আর্থিক স্বাধীনতা ফিলিপাইনোদের দিতে ইচ্ছুক ছিল। ফিলিপাইনের ধনী এবং মজুরের দল সেরূপ সম্বন্ধ আমেরিকার সঙ্গে ছিন্ন করতে চাইত না কারণ এতে তাদের সমূহ ক্ষতি হবারই কথা ছিল, কিন্তু মধ্যবিত্তের দল আমেরিকার সংগে সমুদয় সম্পর্ক ছিন্ন করতেই চেষ্টা করত। কারণ, এতে

তাদের দালালী আমেরিকার মধ্যবিত্তের পকেটে না গিয়ে নিজের পকেটে যাবার ব্যবস্থা হত। তবে ফিলিপাইনের প্রগ্রেসিভ সমাজ তখনকার দিনে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে চীনের প্রগ্রেসিভ সমাজের মুখের দিকে চেয়ে থাকত। চীনের মাও, ফিলিপাইনোদের কাছে কোন বাণী পাঠাননি; সে কথা আমি জেনেছিলাম এবং সেজন্য ফিলিপাইনের প্রগতিশীলরা আসলে দুঃখিতও ছিলেন। সংক্ষেপে ফিলিপাইনের তখনকার দিনের রাজনীতির কথা বলতে বাধ্য হলাম। কারণ, ফিলিপাইনোরা আর তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে না এবং জাপানীদের পদানতও হয়ে থাকবে না, এটা নিশ্চয় অনেক ফিলিপাইনো বুঝতে পেরেছিল, জাপানের কৃপাদৃষ্টি একদিন তাদের প্রতি হবেই, সেজন্য প্রগতিশীল ফিলিপাইনোরা জাপানীদের মোটেই পছন্দ করত না এবং যেমনভাবে ফিলিপাইন দ্বীপে জাপানীদের সংখ্যা বাড়ছিল তাতে তারা ভীতও হচ্ছিল। যখনই একটা দুর্বল জাত অন্য একটা শক্তিশালী জাতের লোলুপ জিহ্বা দেখে, তখনই তারা ভয়ে কেঁপে উঠে। এদিকে একজন ফিলিপাইনো জাপানে গিয়ে ফিলিপাইনোদের নেতা সেজে বসেছিলেন তিনিই বর্তমানে বোধ হয় ফিলিপাইনোদের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ফিলিপাইনোরা জাতে ব্রাউন মংগোলিয়ান। জাপানীরাও তথা। ভাষার পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু খাদ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য বড় নাই। উভয় জাতই এশিয়াটিক, তবে এক জাতকে অন্য জাত ভয় করে কেন? ভয়ের একটি মাত্র কারণ আছে, সেই কারণটি হল, জাপানীদের আর্থিক অবস্থা অতীব নীচ স্তরের। আর আমেরিকা, ফিলিপাইনোদের যে আর্থিক অবস্থায় টেনে তুলেছে তা তিনগুণ উচুস্তরের। জাপানে তখনকার দিনে একজন মজুর বার ঘণ্টা কাজ করে মাসিক পন্চাশ ইয়েনের বেশী পেত না। পন্চাশ ইয়েনের দ্রব্য কেনার যে ক্ষমতা, ফিলিপাইনে তা তিরিশ পেসোতে কেনা যেত; অথচ প্রত্যেকটি ফিলিপাইনো মজুর দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করে মাসিক ৬০

পেসোর মত পেত। রবিবারে কাজ তাদের করতে হত না, অর্ধেকটা শনিবারও তাদের বন্ধ থাকত, এদিকে জাপানে শুধু রবিবারই বন্ধ থাকত। ফিলিপাইনের মজুর একজন্যই জাপানীদের ভয় করতে বাধ্য হত।

ফিলিপাইনো ধনীরা জাপানীদের সাপের চেয়েও বেশি ভয় করত। ফিলিপাইন দ্বীপগুলি জাপান হতে বেশী দূর নয়। জাপানের অনেক কাজ কর্মের কথাই ফিলিপাইনোরা অতি সহজে জানতে পারত। ফিলিপাইনের লোক ১৯৩০ সাল পর্যন্ত জাপানীদের বন্ধুভাবেই গ্রহণ করত এবং সেজন্যই তাদের দেশের একজন লোককে জাপানে পাঠিয়েও দিয়েছিল। সেই লোকটি আগা গোড়াই আমেরিকানদের বিরুদ্ধাচরণ করতেন এবং জুলু জাতটাকে যাতে লোপ করা যায় তার ফিকিরে ছিলেন। আমেরিকানরা Divide and rule নিয়ম মেনে চলত না এবং এখনও তা মেনে চলেনা। আমেরিকানরা কখনও জুলু জাতটাকে টেনে তুলে ফিলিপাইনোদের দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করত না তবে ফিলিপাইনোরা যখন জুলুদের প্রতি একটু আধটু Shooting (স্যুটিং) করত, তখন প্রতিবাদ না করে পারত না। জুলুরা হল ধর্মে মুসলমান। এদের মুছে ফেলে তাদের অধিকৃত ভূমি জাপানীদের দেবার জন্যে জাপান সরকার পক্ষপাতী ছিলেন বলেই জাপানী সংবাদপত্রগুলি ফিলিপাইনোদের জুলু স্যুটিং-এর কথা জানত, কিন্তু কিছুই বলত না। তার একমাত্র কারণ মালয়, জাতটাই হল ইন্‌ডিভিজুয়েলিষ্ট। উপরন্তু তাদের কোন সংবাদপত্রও ছিলনা যাতে করে তারা জগতবাসীকে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে পারে। ফিলিপাইনের ধনীরা জাপানী চরিত্র কতকটা তাদের নিজের দেশের ব্যাপারেই বুঝতে পারল। এতে ফিলি-পাইনের ধনীরা জাপানীদের প্রতি একদম বিগড়ে বসেনি। পরে একদিন বিগড়ে বসল, যেদিন তারা স্বচক্ষে দেখে আসল মানচুরিয়াতে চীনাধনীদের অকাল মৃত্যু।

আমেরিকার ধনীরা ফিলিপাই না ধনীদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছিল এবং ফিলিপাইনো ধনীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল তারা ফিলিপাইনোদের যে অধিকার দিয়েছে তা ফরাসী ধনীরা ইন্দোচীনে দেয়নি এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও ভারতীয় ধনীদের দিতে কোন মতেই রাজি নয়। বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যে কলোনিয়েলদের সম অধিকার না দিলেও নীলদর্পণের পুনরভিনয় করে না। এতে ইন্দোচীনের ধনীরা এবং ভারতের ধনীরা বেঁচে থেকে দুপয়সা কামাচ্ছিল এবং এখনও কামাচ্ছে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর উত্তম শিষ্য জাপান শুরু হতেই মানচুরিয়ায় "নীলদর্পণের" পুনরভিনয় আরম্ভ করলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদের গলদ বুঝতে পেরেই নীলদর্পণ আর ঘটতে দেয়নি। এদিকে জাপান কিন্তু তা পরিত্যাগও করতে পারছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা তাদের সুখ এবং সুবিধার জন্য ডেকে এনেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এই বুদ্ধিজীবিদের কথামত চলত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা যখন দেখিয়ে দিল "নীলদর্পণের' কুফল হচ্ছে তখন চালক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কিন্তু চীনা বুদ্ধিজীবিরা ডেকে নিয়ে যায়নি।

সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর লোক বেশ একটু জ্ঞানী হয়েছে, তাই দুর্ভাগা জাপানী সাম্রাজ্যবাদী বাধ্য হল মানচুরিয়ায় তার গুরুর কাছে শেখা নীলদর্পণের অভিনয় করতে। এতে ফিলিপাইনো ধনীরা হুঁশিয়ার হল এবং আমেরিকার ধনীদের সহযোগিতা পেয়ে ফিলিপাইনো মজুরদেরও বুঝিয়ে দিল, যদি জাপান আসে তবে তাদেরও রক্ষা নাই। স্বার্থ বড় বালাই। ফিলিপাইনো মজুর বুঝল, জাপানীরা তাদের শত্রু এবং সেজন্য একযোগে ফিলিপাইনো সরকারের কাছে আবেদন করল জাপানী সিল্ক দ্রব্যের উপর নতুন কর ধার্য্য করা হউক। ফিলিপাইনো সরকার সেরূপ আবেদনের

অপেক্ষায়ই ছিলেন। তৎক্ষণাৎ জাপানী রেশম শিল্পের উপর দুইশত পারসেন্ট টেক্স বসান হল।

কিন্তু জাপান আমেরিকা হতেও বেশি চতুর। জাপানী ধনীরা যেমন ধন জমাতে পারে, তেমনি তাদের সম্রাটের আদেশে ক্ষণিকের মাঝে যথাসর্বস্ব পরিত্যাগও করতে পারে। জাপানী মজুররাও রাজভক্ত। রাজসেবাই তাদের একমাত্র কাম্য। রাজার আদেশে একবেলা খেয়েও তারা পুরাদমে মজুরী করতে পারে। সেজন্যই দুইশত পারসেন্টের বেশি শুল্ক দিয়েও জাপান ফিলিপাইনে সিল্ক পাঠাতে লাগল। ফিলিপাইনোরা কিন্তু সেরূপ নয়। রাজভক্ত হওয়া দূরের কথা তারা রাজার নামও শুনতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের দৌলতে তারা কড়ায়গণ্ডায় মাইনে হিসাব করে নিতে শিখেছে। একদিকে ফেনাটিক রাজভক্ত মজুর, আর অন্যদিকে প্রগতিশীল উন্নতমনা ফিলিপাইনো। বুদ্ধিজীবি ফিলিপাইনোরা অবস্থা দেখে প্রমাদ গণল। পরাধীনতার নাগপাশে তারা আবদ্ধ। স্বাধীনতার আন্দোলন তখন নতুন করে জাগিয়ে তোলা কেউ পছন্দ করল না। তারা জানত, কয়েক বৎসরের মাঝে ফিলিপাইনোরা স্বাধীনতা পেয়েও জাপানকে রুখবার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। সেজন্য সর্ব আশা পরিত্যাগ করে একদল ফিলিপাইনো বুদ্ধিজীবি আমেরিকায় গিয়ে আন্দোলন করাই প্রশস্ত মনে করল। আমেরিকা কি তাদের কথা শুনল? কিছুই শুনল না। উপরন্তু জাপানের সহিত ব্যবসা আরও আগ্রহের সহিত চালাতে লাগল।

যখন ফিলিপাইনোদের এরূপ দুঃসময়, তখনই আমি মেনিলাতে পৌঁছি। মেনিলায় পৌঁছবার পর আমার বাণী শুনবার জন্য কেউ দৌড়ে আসেনি। আমি নিজেই সংবাদপত্রের সম্পাদকদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলাম। সম্পাদকদের মাঝে কেউ কেউ আমাকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন আর

কেউবা তাদের বিদ্যা এবং বুদ্ধির আতিশয্য দেখাবার জন্য গম্ভীরভাবে আমার সংগে কথা বলেছিলেন। তাঁরা যেভাবেই আমাকে গ্রহণ করুন না কেন, আমি জানতাম এসব সংবাদপত্রসেবীদের নিজের কোন মতামত নাই, এরা মাত্র ভৃত্য। কেবল কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যাওয়াই এদের কর্তব্য। অনেকেই আমার রিপোর্ট আমার সামনে লেখলেন, কিন্তু তাঁরা যা লেখেছিলেন, তা প্রকাশিত হয়নি। তাদের কর্তা মহাশয়গণ যে সুর বাজাতে বলেছিলেন সেই সুরই তারা গাইলেন। পুঁজিবাদী যুগে দৈন্যতা নানা রকমের, সংবাদপত্র সেবীদের দৈন্যতা তার মাঝে একটি।

মেনিলাতে আমার আগমন সংবাদ দুভাবে দু' শ্রেণীর সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। একশ্রেণীর সংবাদপত্র চীনাদের প্রতি বেশ একচোট নিয়ে আমার বাহাদুরীর কথাই সকলের কাছে বলেছিলেন। অন্য শ্রেণীর সংবাদপত্র, আমি বাহাদুর কি পর্যটক তাই নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। "বাহাদুর যারা হয় তাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে এবং যারা পর্যটক হয় তাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। পর্যটক বের হয় জ্ঞান অর্জনের জন্য। তাদের জ্ঞাতব্য বিষয় কোনও এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।" এই কথাগুলি বলেই একজন সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, "পথিক, তুমি কোন পথে চলেছ?" আমি এই সম্পাদকটির সংগে সাক্ষাৎ করাও দরকার মনে করলাম না, কারণ এরূপ সম্পাদকের কাছ হতে দূরে থাকাই ভাল। যেদিন মেনিলাতে পৌছলাম সেদিনই আমি কোন সংবাদপত্র অফিসে যাইনি। সংবাদপত্র অফিসে গিয়েছিলাম মেনিলাতে পৌছার চারদিন পর। সংবাদপত্রে আমার আসার সংবাদ বের হবার পরই মেনিলার লোক আমাকে চিনতে পারে এবং আমিও সর্বসাধারণের সংগে মিশতে সুযোগ পাই। কিন্তু যেদিন আমি মেনিলাতে পৌছি, সেদিনই টের পাই কয়েকটি লোক আমার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখছে। সেই লোকগুলি কে

এবং কাহারা তাই জানতে আমিও একটু উৎসাহিত হই। আমি স্থান নিয়েছিলাম শিখদের গুরুদ্বারে। শিখদের মাঝে অনেক আমেরিকা ফেরতা গদর পার্টির লোক ছিল। তারাও গুরুদ্বারে নাকি যাওয়া আসা করত। তাদের গতিবিধি নাকি কতকগুলি লোক লক্ষ্য রাখত। আমাকে দেখতে শিখদের মত দেখাত না অথচ কেন যে আমার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার হয়েছিল তা বাস্তবিকই একটু রহস্যজনক বলেই মনে হয়েছিল।

গুরুদ্বারে সিগারেট খাওয়া যায় না। তাই সিগারেট খাবার জন্য এবং সিগারেট এনে রাখার জন্য একটা স্থান খুঁজতে লাগলাম। সেখানে একজন পান্জাবী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি আমাকে গুরুদ্বারের নিকটস্থ বাসিন্দা একজন বই বিক্রেতা ফিলপাইনোর সংগে পরিচয় করে দেন। পুস্তক বিক্রেতা একজন দেশপ্রেমিক। আমাকে পেয়ে তিনি সুখী হন। আমি তাকেই অনেক সময় আমার সুখ দুঃখের কথা বলতাম, এবং যারা আমার গতিবিধি লক্ষ্য রাখছিল তাদের কথাও বলেছিলাম। পুস্তক বিক্রেতা আমার কথা শুনে কয়েক দিন কিছুই বললেন না। কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে তাঁর ঘরে দেখতে পেয়ে বললেন "মেনিলাতে এমন কিছু দেখার নাই যা দেখে আপনি সময় কাটাতে পারেন। যদি পারেন ত আগামী কাল সকাল বেলাই বাগিও নামক স্থানে রওয়ানা হউন। বাগিও দেখে ফের মেনিলা চলে আসবেন। মেনিলা হতে অন্যত্র যাওয়াই ভাল। এদেশে বসে থেকে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এখানে যে সকল লোক আপনার পেছন নিয়েছে তারা হল ভাড়াটে। কার ভাড়াটে এসব কথা জেনে আপনার কোন লাভ নাই, তবে এরা রিপোর্ট লেখে বেশ দুপয়সা পায় বলেই মনে হয়। এদের রিপোর্ট লেখতে দিয়ে আপনার লাভ ত হবেই না, উপরন্তু ক্ষতি হবারই সম্ভাবনা বেশি।" পুস্তক বিক্রেতার কথা শুনে সময় না কাটিয়ে পরের দিনই সকাল বেলা বাগিও রওয়ানা হলাম। একটু যেতে না যেতেই একজন

ভারতীয় ভদ্রলোকের সংগে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনিও বাইসাইকেলে বাগিও রওয়ানা হয়েছেন। তার চাল চলন দেখে মনে হ'ল তিনি এ পথের যাত্রী মোটেই নন আমার পেছন নেওয়াই তার এক মাত্র লক্ষ্য। আমি তার সংগে বেশি কথা না বলে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু পথ সর্বত্র সমান নয়। পিচ দেওয়া পথ শেষ হয়েছে। গ্রেভেল দেওয়া পথের আরম্ভ হয়েছে। সাইকেল ক্রমেই লাফিয়ে উঠছে এবং এমনও হচ্ছে যে সামনের পাথরের টুক্‌রায় সাইকেল ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছি। আমার পেছন যিনি নিয়েছিলেন তার সংগে জল অথবা খাদ্য ছিল না, সেজন্য কয়েক মাইল চলার পরই তাকে অতি কষ্টে পথ চলতে হয়েছিল। তার কষ্ট দেখে আমি একটুও দুঃখিত হইনি। যারা সামান্য কয়টি মুদ্রার বিনিময়ে নিজের জাত-ভাইএর শত্রুতা করে তাদের এরূপ ভাবে কষ্ট পেতে দেখলে দুঃখ হয় না, বরং বেশ ভালই লাগে। অবশ্য রুচির পার্থক্য থাকবেই।

পার্বত্য পথ আরম্ভ হয়েছে। পার্বত্য ভূমির প্রখর সূর্য কিরণ মৃদুমন্দ শীতল বাতাসে আরামপ্রদ করে তুলেছে। সূর্যের আলো আরও পরিষ্কার এবং শুভ্র বলে মনে হচ্ছে। এমনি পথে আমি আরাম করে চলছিলাম আর মনে হচ্ছিল জন্মভূমির কথা। কবি বাইরে যান না। ঘরে বসেই তাঁরা বাইরের কথা ভাষার মারফতে ফুটিয়ে তুলেন। মনে হয় এরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংগে তাঁরা কতই যেন পরিচিত এবং সেই পরিচিত স্থানের কথা তাঁরা সরল ভাষায় বলে যান। অনেক সময় কবিদের ভাবধারা পাবার ইচ্ছা করে কিন্তু মনের জাগরণ না হলে তা পাওয়া যায় না। আমার মনের জাগরণ হয়নি সত্য কথা, কিন্তু কবিদের সাধনার দৃশ্য আমি সজীব অবস্থায় দেখছিলাম।

সামনে গ্রাম। গ্রাম সৌন্দর্যে ভরা। গ্রামের বুক চিরে পথটা চলে গিয়েছে, আর তারই উপর দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম কোন দিকে কার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করি।

বেশিক্ষণ চিন্তা করলাম না, সামনেই একজন ভারতীয় দোকানদার বাইরে দাঁড়িয়ে তার দরজার গ্লাস পরিষ্কার করছিল। সে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমি আমার পরিচয় তার কাছে দিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে লোকটি সুখী হল এবং ঘরে গিয়ে বসতে বলল।

যিনি পেছন নিয়েছিলেন তিনি গ্রামে পৌঁছে একটু ও বিশ্রাম না করে, সাইকেলের প্যাডেল কষে চাপ দিয়ে গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করতে পারলেন না। কোথা হতে দুজন লোক এসে তাকে বেশ করে ঠেংগিয়ে কোন দিকে চলে গেল। ঘরের বাইরে এসে কেউ জিজ্ঞাসা করল না,—কেন এই পথচারীকে অনর্থক আঘাত করা হয়েছে? এটা ফিলিপাইন। এখানে হাইকোর্টেও অনেক মারামারি হয়ে গেছে। ফিলিপাইনোরা হাতাহাতি মোটেই পছন্দ করে না। পিস্তল, অতোমেত, হাতবোমার ব্যবহার এদেশে বেশ চলে, সেজন্যই এখানে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। এদেশে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষি যখন সাক্ষ্য দেয় তখন ভাবে সে কি বলছে, এতে তার জীবন বিপন্ন হবে না ত? 'জীবন পদ্মপত্রের জল', আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বলে গিয়েছেন। আমাদের সে অনুভূতি হয়নি, অনুভব করেছে বিদেশী।

লোকটা বেশ মার খেল তারপর যা হবার তাই হ'ল। আমার প্রতি তার প্রবল আক্রোশ হয়েছিল। কিন্তু আমার কি করতে পারে? যার সাহায্যকারী সমুদয় মানব সমাজ, তার অনিষ্ট সহজে করা যায় না। রাজদ্বারে ভারতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটা যায়, কিন্তু বিদেশের কোথাও তা পারা যায় না, এমন কি ইংলণ্ডেও নয়। প্রতিশোধ আপনি প্রতিধ্বনিত হয় আর মিথ্যাবাদী আপনি কোথায় তলিয়ে যায়, তার পাত্তাও কেউ পায় না। আমি নিরাপদে এবং নির্ভয়ে চলতে লাগলাম। ভিক্ষা করলাম, টাকা

পকেটস্থ করলাম, একজনের বাড়ীতে পেট ভরে খেলাম তারপর একজন ভারতীয় মজুর আমাকে তার লরিতে বসিয়ে বাগিও পৌছে দিল।

আমি আমার অশান্তির কথাই বলতে আরম্ভ করেছি। আমার কাছে প্রত্যেকটি জিনিসই উলটা পালটা ভাবে দেখাতে লাগল। ভাবছিলাম আমেরিকানরা বিদেশী লোকের বেশ উন্নতি করছে। ফিলিপাইন আমেরিকার বিদেশই বটে কিন্তু এখানে তারা ইগ্রোথদের কোনই উন্নতি করেনি। তারা বৃটিশ প্রচলিত "কুইন্স প্ররেমেশনই" এখানে বজায় রেখেছে। ইগ্রোথ বলে এখানে এক রকমের লোক আছে। তাদের পুরুষগুলির কোমরের উর্ধভাগ দেখলে মনে হয় যেন একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক কোট, নেকটাই পরে ফেল্টহেট মাথায় দিয়ে আছে, আর কোমরের নীচের দিকটা একেবারে উলংগ। একজন আমেরিকানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এদের ধোঁতি এবং জুতা মোজা পড়ান শিক্ষা দেওয়া হয় না কেন? ভদ্রলোক বললেন "এটাই হল আমেরিকানদের ডিমক্রেসী।"

আমি ভদ্রলোককে বললাম,"এটাই হল আমেরিকার স্বরূপ অর্থাৎ ইম্‌পারিয়েলিজম।" আজকাল আমাদের দেশে বড় বড় শব্দের ব্যবহার অনেকেই পছন্দ করেন না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকতে চাও চাঁদমুখ, তবে ঐ বড় বড় শব্দের মানে শিখতে হবে নতুবা টিকা না নেবার জন্য যেমন করে, তথা কথিত "মায়ের দয়া হয়" তেমনি ইগ্রোথদের মত ন্যাংটা হয়ে বহুরূপী সেজে দিন কাটাতে হবে।

বাগিওতে ছিলাম একজন সিন্ধি ব্যবসায়ীর দোকানে। দোকানী বড়ই উদার এবং উত্তম নাগরিক। তিনি আমাকে থাকবার জন্য একখানা রুম দিয়ে বলেছিলেন, "এই রুমটাতে আপনি এক মাস পর্যন্ত আরাম করে থাকতে পারেন। এক মাস পরও যদি থাকবার ইচ্ছা হয় তবে আপনার জন্য অন্য ব্যবস্থা করব এবং সেজন্য আপনাকে উপযুক্ত ভাড়াও দিতে হবে।" তার

কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম এবং বলেছিলাম "এখানে এক মাস কেন এক সপ্তাহও থাকব বলে মনে হয় না। কারণ, এখানে এমন কিছু নাই যা দেখে আমি সময় কাটাতে পারি।" বাস্তবিক বাগিওতে এসে নেংটা ইগ্রোথ ছাড়া দেখার মত আমার কিছুই ছিল না। সাত দিন থেকেই আমি মেনিলাতে ফিরে এসেছিলাম।

আবার সেই পর্ব আরম্ভ হল। সাইকেল নিয়ে এবার আরও কয়েকটা লোক আমার পেছন ঘুরতে লাগল। আমিও নিশ্চিন্ত মনেই মেনিলাতে এটা সেটা দেখে সময় কাটাতে লাগলাম, কিন্তু যখনই জাহাজের টিকিট কেনার কথা মনে হ'ত তখনই একটা অবসাদ এসে আমার ঘাড়ে চাপত। বিদেশে যাবার পরও অনেকের শ্বেতকায় ভীতি থেকে যায়। আমার কিন্তু মোটেই শ্বেতকায় ভীতি ছিল না। এমেরিকানদের ক্লাবে, বড় বড় অফিসে এবং যে সকল স্থানে শুধু শ্বেতকায়রাই গিয়ে আমোদ করে সেই স্থান গুলিতেও যেতাম। ভয় আমার ছিল না, বরঞ্চ আমি সকল সময়ই প্রস্তুত থাকতাম, সেজন্যই বোধ হয় আমাকে কেউ ঘাটাত না। একদিন সমুদ্রতীরে যে স্থানে এমেরিকান মেরিনদের ক্লাব রয়েছে সেস্থানে সিমেণ্টের ডকের উপর বসে নানা কথা ভাবছিলাম, এমনি সময় একজন ডাচম্যান মালয় ভাষায় বলল "এই রোদের তেজ তোর গায়ে লাগছে না?" আমি বললাম, "জানিস্‌ নারে, সূর্য যে আমাদের মামা হয়, তার তেজ আমাদের মাঝেও রয়েছে, আমরা সূর্যের তেজকে ভয় করি না, কিন্তু ভয় করি বাঘিনির তেজকে।" মালয় ভাষায় যখন কোন লোক বন্ধু বলে সম্বোধন করে তখন এরূপ ভাবে কথা বললে সাধারণ লোক আনন্দই পায়। নাবিক আমার কথায় আনন্দই পেয়েছিল। সে এসে আমাকে বলল, "চল্‌ একটা কাফেতে যাই।" আমি কাফেতে যেতে প্রস্তুত ছিলাম।

কাফেতে এসে কথা প্রসংগে তাকে বললাম, "আমি বলি দ্বীপে যেতে চাই, তাতে কি ভিসার দরকার হবে?" সে আমায় যখন বলল, "এখন

থেকে বৃটিশ প্রজাদের সুরবায়া অথবা বলি-দ্বীপে যেতে ভিসার দরকার হয় না", তখন আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। আমি তৎক্ষণাৎ টিকিট কেনার জন্য কে, পি, এম, লাইনের অফিসের দিকে রওয়ানা হলাম।

কে, পি, এম লাইন বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানী। তার অফিস মস্ত-বড় একটা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। বাড়িটার সামনে গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়ালাম, তারপর অফিসের কাউন্টারে গেলাম। এদিকে সর্বত্রই নিয়ম হ'ল কোন ইউরোপীয়ান যদি কাউন্টারে এসে দাঁড়ায় তবে তার কথাই সর্বপ্রথম শুনা হয়। এবিষয়ে আমি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলাম বলেই এক দিকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু দুনিয়া প্রত্যহ বদলাচ্ছে। হলাণ্ডের কর্মচারী মহলে প্রগতির বাণ ডেকেছিল। নৌসৈন্য এবং পদাতিক সৈন্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছিল, ছোট খাট লড়াইও হয়েছিল বলে লোক মুখে শুনা যাচ্ছিল। এর কারণ যদিও অব্যক্ত তবুও এবিষয় নিয়ে নানা লোক নানা কথা বলছিল। কয়েক জন ইউরোপীয়ানকে সামনে দাঁড়া করে রেখেও একজন ডাচ কেরানী আমাকে ডেকে বলল, "মশাই, এদিকে আসুন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?" আমি তার কাছে গেলাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, "বলিদ্বীপ যাবার টিকিট কিনতে এসেছি, একখানা টিকিট দয়া করে দিন। ডাচ কেরানী আমার মুখের দিকে অনেকক্ষন তাকিয়ে বলল "টিকিট দিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কথা হল, যদি বালিদ্বীপে যেতে চান তবে একশত পনচাশ গিলডার (দুই শত পনচাশ টাকা) জমা দিতে হবে। নিয়ম হল, যদি ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে ছয় মাস না ফুরাতেই অন্যত্র যান, তবে আপনার গচ্ছিত টাকা ফেরত দেওয়া হবে। ছয় মাসের এক দিনও যদি বেশি থাকেন তবে সে গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। আমার মনে হয় আপনাকে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে ছয় মাসের বেশি থাকতে হবেনা, কেমন তা নয় কি?" আমি শুধু "হাঁ" বলতেই ডাচ কেরাণী বলল, "শুধু

হাঁ বললে হবেনা, একশত পনচাশ গিলডারের মত স্থানীয় মুদ্রা আপনার কাছে আছে কি?" আমার মুখ হতে অতিকষ্টে "না" কথাটি বের হল। আমার মুখ হতে "না" কথাটি শুনার পর কেরানী কাউণ্টার হতে বের হয়ে এসে নিকটস্থ একটা কাফেতে গিয়ে বসলেন, এবং বললেন "প্রিয়বন্ধু, আপনার আসার সংবাদ আমি পেয়েছি এবং আপনার কাছে যে টাকা নাই সে সংবাদও আমি রাখি। টাকার জন্য আপনি ঘাবড়াবেন না, আজই বিকালে পাঁচটার সময় আপনি "পাহুমল ব্রাদার্স" অফিসে যাবেন। সেখানে আমার লোক থাকবে। সেই লোকটি আপনার দরকারী টাকার দ্বিগুণ টাকা চাঁদা পাইয়ে দেবে।" কথাটা শুনে আমার বেশ আনন্দ হ'ল, কিন্তু জানতে ইচ্ছা হ'ল, আমার আসার সংবাদ না হয় তিনি সংবাদ পত্রের মারফতে পেয়েছেন, তবে আমার কাছে যে টাকা নাই সে সংবাদটা কি করে পেলেন? ডাচ কেরানীকে এসম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছুই বললাম না, কিন্তু কৌতূহলটা অনেক দিন সজীব ছিল। ডাচ কেরানী হতে বিদায় নিয়ে গুরুদ্বারে গেলাম এবং বিছানায় শুয়ে নানা কথা চিন্তা করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিকাল পাচটা হলে কি হয়, মেনিলায় সূর্য কিরণের উত্তাপ তখনও কমেনি। তখনও বিকালের পথচারী পথে বের হয়নি। এমনি সময় একটি লোক এসে আমাকে ডেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল, "অসময়ে ঘুমান ভাল নয়, উঠে বসুন।" আমি উঠে বসলাম এবং মনে হল আমাকে যেতে হবে "পাহুমল ব্রাদার্স"এর দোকানে। তৎক্ষণাৎ কাপড় পরে "পাহুমল ব্রাদার্স"এর দোকানের দিকে রওয়ানা হলাম। দোকানে তখন অনেক লোকের সমাগম হয়েছে, কতক্ষণ পরই দোকান বন্ধ হবে। তাড়াহুড়া করে অনেকেই সওদা কিনছিল, এমন সময় দোকানে প্রবেশ করাটা ভাল হবে না ভেবে দোকানের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কতক্ষণ পরে আমার পূর্ব পরিচিত পুস্তক বিক্রেতা দোকান হতে বের হয়ে আমাকে দেখতে পেলেন এবং ব্যস্ত-

সমস্ত হয়ে বললেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন, আপনার দেশের লোকের কাছে আমি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব।" কথা না বাড়িয়ে আমি তার পেছনে চলতে লাগলাম। পুস্তক বিক্রেতা ঘরে প্রবেশ করে আমাকে সোজা ম্যানেজার মহাশয়ের কাছে নিয়ে বললেন, "এই হলেন অমুক, তাকে সাহায্য করা আপনাদের কর্তব্য। ম্যানেজার মহাশয় সাহায্য করতে রাজি হলেন এবং কত সাহায্য করতে হবে তা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তার প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বেই পুস্তক বিক্রেতা এমন একটা টাকার পরিমাণ বললেন যা আমার কোন দরকারই ছিল না। আমি কিছু না বলে মাথা নত করে থাকলাম তারপর ম্যানেজার এবং পুস্তক বিক্রেতা কি করে চাঁদা উঠান যায় তারই কথা বলতে লাগলেন। বুঝলাম, নির্ধারিত টাকাটা চাঁদা করে উঠাতে হবে এবং সেজন্য অন্ততপক্ষে তিনদিনের বেশি সময়ও লাগতে পারে। পরের দিন সকাল হতে রীতিমত ভিক্ষার অভিযান সুরু করলাম। যাদের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম তারাই আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগল। যাদের মনোমত প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হলাম তারা যা আশা করা হয়েছিল তার দ্বিগুন, কেউ তিনগুণও চাঁদা দিল, আর যাদের মনোমত প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হলাম, তারা তাড়িয়ে দিল না, শুধু জানিয়ে দিল তাদেরই অর্থাভাব, আমাকে কি করে সাহায্য করবে? সমান দরে সকলকেই ধন্যবাদ দিলাম, এমন কি নেসনেলিষ্ট চীনারা পর্যন্ত তা হতে বাদ পড়েনি। ভিক্ষার দৌলতে পৃথিবীর মানুষ যেমন করে চিনতে সক্ষম হয়েছিলাম অন্য কিছুতে তেমনটি চিনতে পারিনি।

এখানেও দুটা দলের বেশ মন কশাকশি দেখলাম। স্টালিন্ এবং ত্রসকী। ত্রস্কাইত চায় বিশ্ববিপ্লব হউক। কিন্তু কাজের সময় তারা থাকে না। আমরা শুনতে পাই প্যান আমেরিকা, প্যান ইস্লাম, বৃহত্তর বাংলা, কিন্তু এর পেছনে মামুলী চুণ যে নাই তার সংবাদ সকলেই রাখে। ত্রস্কাইতরাও

সেরূপই বড় বড় কথা বলে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের লেজ ধরেই ঝুলে থাকে। পুস্তক বিক্রেতা মহাশয় সকল সময়ই আমার সংগে থাকতেন এবং যখনই দেখতেন আমি হতাশ হয়ে গেছি তখনই বলতেন, "এরূপ করলে চলবে না বন্ধু, কাজ করতেই হবে। যেদিন আমার দরকারি টাকা পেয়ে গেলাম সেদিন পুস্তক বিক্রেতা এবং ডাচ কেরানীকে বললাম, "আমি আর ভিক্ষা করব না, আমার দরকারী টাকা পেয়ে গেছি।" কিন্তু ডাচ কেরানী হারবার পাত্র নন্। আমাকে দিয়ে ভিক্ষা করাবেনই এবং পুস্তক বিক্রেতা আমার সংগে থাকবেনই। মনে হয়েছিল এই দুইজন আমার ভিক্ষার টাকার ভাগ বসাবে, কিন্তু পরে দেখলাম তা নয়. তাঁদের অন্য মতলব। তাঁরা জানতে চান, পুস্তক বিক্রেতার উপস্থিতি সত্ত্বেও কে কে আমাকে সাহায্য করল তার একটা ফিরিস্তি করতে, কারণ পুস্তক বিক্রেতা সর্বসাধারণের চক্ষে ভাল মানুষ ছিলেন না। তখনকার দিনে ফিলিপাইন দ্বীপে প্রগতিশীলদের কেউ দেখতে পারত না। সর্বসাধারণের ধারণা ছিল প্রগতিশীলরা ধর্মের নিপাত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং সে ধরনের প্রোপাগাণ্ডা ও স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণেই করছিলেন, তবুও লোকের মনে প্রগতিশীলদের কাজকর্ম জানবার একটা বিশেষ কৌতূহল হয়েছিল। আমার কাছে সে সম্বন্ধেই অনেকে প্রশ্ন করত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সোভিয়েট রুশ ভ্রমণ করিনি যখন বলতাম, তখন অনেকেরই মন ভেংগে যেত। যাকে এত ঘৃণা করা হয় তার সম্বন্ধে জানবার এত আগ্রহ দেখে আমি অবাক হতাম. আর ভাবতাম আমাকে একবার সোভিয়েট রুশিয়ায় যেতেই হবে।

যারা আমাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের যেমন করে বাসনা পূরণ হল, আমারও দরকারী টাকা কয়েকদিনের মধ্যেই যোগাড় হয়ে গেল। এবার আমার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হতে বিদায় হবার পালা। কে, পি, এম, জাহাজ কোম্পানির অফিসে গিয়ে একশত পনচাশ গিলডার জমা

দিয়ে বলিদ্বিপগামী একখানা জাহাজের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনলাম। যে জাহাজটাতে করে যাবার কথা ছিল সেই জাহাজের নাম বেশ লম্বা এবং উচ্চারণ করতে কষ্টকর ছিল। সেজন্য যে জেঠি হতে জাহাজ ছাড়বে সে সংবাদই জেনে নিয়েছিলাম। আমি জানতাম একবার পাসপোর্ট কাস্টম অফিস হতে যখন আমার হাতে দেওয়া হবে তখনই আমাকে জাহাজে গিয়ে উঠে বসতে হবে, এবং যে পর্যন্ত জাহাজ না ছাড়বে সে পর্যন্ত জাহাজেই থাকতে হবে। তীরে ভিড়ানো জাহাজে কেউ বসে থাকতে চায় না। তারপর যদি কাউকে বলা হয় তুমি জাহাজ হতে নামতে পারবে না তবে জাহাজ ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত জাহাজে সময় কাটানো আরও কষ্টকর হয়। আমি সে কষ্ট পেয়েছিলাম বলেই ফের যাতে আর এরূপ কষ্ট না পাই তারই চেষ্টা করেছিলাম। মানুষ সহজে কারো প্রতি বিগড়ায় না। ইউরোপীয় ধনীর দল ইউরোপের জনগণকে চারিদিক থেকে চেপে মারছিল বলেই তাদের মাঝে এত বিদ্রোহ হয়েছে, এত যুদ্ধ হয়েছে, আর তারা এত উন্নতি করেছে। আমাদের বুড়ারা বিলাত ফেরতাদেরও ছায়া মাড়ানো পাপ মনে করতেন, সমুদ্রযাত্রা মহাপাপ কাজ ছিল, অতএব আমাদের কাছে জাহাজে কয়েদী হয়ে থাকার কষ্ট নতুনই বটে। আমাকে এসব দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে চলতে হয়েছিল, সেজন্য আমি হাসব কি কাঁদব তা ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।

বিদায়

আজই সকালবেলা জাহাজ ছাড়বে। হয়ত অনেকে বলবেন "বলুন না সে সন তারিখটা কত ছিল, আপনার সম্বন্ধে আমরা গবেষণা করব" আমি সে গবেষণার পক্ষপাতী নই বলেই তারিখটি লেখলাম না। আমি চাই বিদেশে গিয়ে যেমন কষ্ট পেয়েছি তেমন কষ্ট আমার জাতের আর কেউ না পায় যেন, তারই ব্যবস্থা করা হউক তবেই হবে প্রকৃত গবেষণা।

যারা আমার পেছন নিয়েছিল তারাও জেনেছিল আজই আমি মেনিলা পরিত্যাগ করব। বল্লমধারী সেপাই যেমন এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে ঠিক তেমনি চারটি লোক যে মুহূর্তে আমি শিখের গুরুদ্বার ত্যাগ করে আসলাম সেই সময় থেকে কখন বা আমার আগে আর কখন বা পেছনে চলতে ছিল। বুঝলাম আমার সামনে বেশ বড় রকমের একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ভ্রমণ সময়ে এরূপ বিপদে পড়া বড়ই খারাপ। এতে ভ্রমণ সমাপ্ত হয় না। আমার ভ্রমণ তখন অনেকটা নিরাশার মাঝেই যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। অর্থাভাবের জন্য কেনাডা হতে বের করে দিয়েছিল, হয়ত সিংগাপুর গেলে জেলে পুরে রাখবে আবার ভ্রমণ হয়ত সিংগাপুরেই খতম হবে। এই চিন্তা করেই পথ চলছিলাম। হঠাৎ পেছন দিক হতে ফিলিপাইনো পাচক ডেকে বলল "ধীরে চলুন আমিও আসছি।" তার আসাতে আমার আনন্দ হল না, নিরানন্দ যেন একটু বেড়েই গেল। পাচক কাছে এসেই বলল "এদের ভয় করবেন না।" আমরা উভয়ে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে সমুদ্রতীরের কাস্টম অফিসের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম, আর যারা আমার পেছন নিয়েছিল তারা কাস্টম হাউস পেছনে রেখে জাহাজ ঘাটে চলে গেল। আমি কাস্টম অফিসারের সংগে নানারূপ কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম।

কাস্টম অফিসার ফিলিপাইনো, তিনিও আমার দুঃখে দুঃখিত হলেন। আমি মেনিলাতে চিরদিনের জন্য থাকতে আসিনি শুনে আমাকে বিদায় দেবার বেলা তারও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বইল। কিন্তু ঐ চারটা ভারতবাসী কোথায়, তারা কি আমার কথা ভুলে গেল? না, তারা আমার কথা ভুলেনি, তারা আমার কথা ভুলতে পারে না। আমার বিদায়ী সংবাদ দেওয়ার পর তারা তাদের পরিশ্রমের বিল করে টাকা আদায় করবে। সে টাকা কিছুটা নিজে ব্যবহার করবে এবং বাকিটুকু আমারই স্বদেশে তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠাবে। পুঁজিবাদী জগতের অর্থের সৎব্যবহার এরূপেই হয়ে থাকে।

কাষ্টম অফিসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজের দিকে চলেছিলেম। বার বার মনে হচ্ছিল এপথে আর এজীবনে পদনিক্ষেপ করতে পারব না। পথটা যদিও আমার কাছে পুরাতন নয়, এবং এটা একটা পথই মাত্র তবুও মনে হচ্ছিল এ সংগে চীরজীবনের মত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। ধীরে পদনিক্ষেপ করছিলাম। ফিলিপাইনো পুলিশ আমার পেছন আসছিল, আমাকে তাড়াতাড়ি পদবিক্ষেপ করার জন্যও বলছিল না, অথবা আমার ধীরে চলার জন্য সে কোনরূপ মুখ কালোও করছিল না। কিন্তু আমার দুদিকে চারটা শয়তানের তীক্ষ্ণ চক্ষু যেন আমায় ভয় দেখিয়ে বলছিল, "তোকে যখন এদেশ হতে যেতেই হবে তখন আর ধীরে পাদনিক্ষেপ করে দরকার কি; আমাদের চলে যেতে দে, তোকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়েই আমরা তোর নামে সাত পাঁচ নানা কথা লেখে রিপোর্ট করব।" মরা মানুষ যেমন কথা বলেনা, তেমনি কথা বলেনা যারা ডিপোর্ট হয়। আমিও প্রকারান্তরে মেনিলা হতে ডিপোর্টই হচ্ছিলাম। আমার কথা বলার কিছুই ছিল না। শুধু বলার ছিল, আমি যে মানুষ হয়েও অমানুষ। আমি পরাধীন। পরাধীনের কিছু বলবার অধিকার নাই।

ফিলিপাইনো পাচক আমার জন্ত কিছু খাদ্য এনেছিল, তাকে সেজন্ত কিছু দিতে চেয়েছিলাম। সে তা নিলনা এবং বলল "পথিক তোমার টাকার দরকার এই নেও আমার দান।" কথাটা বলেই সে আমার হাতে পাঁচটি পেসো রেখে বেরিয়ে গেল। আমি তারই দিকে অনেকক্ষন তাকিয়ে থেকে কেবিনে গেলাম। কেবিনে কেউ ছিল না। একাকী বসে অনেকক্ষন নানা চিন্তা করে যখন আর পেরে উঠলাম না তখন পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে দেখতে লাগলাম।

প্রশান্ত সাগরের দক্ষিণ দিকের দ্বীপগুলি বড়ই সুন্দর। কোন দ্বীপ জলের সংগে সমতল আবার কোনও দ্বীপ হঠাৎ জল থেকে উঠে যেন আকাশের দিকে ধেয়ে চলেছে। এরূপ দ্বীপ লহরীর পাশ কাটিয়ে আমাদের জাহাজ চলতে লাগল। সারাদিন বাইরে বসে তাই দেখতাম আর রাত্রে পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম। দুএকটি লোক কখন কখন এসে কথা বলত। তাদের কথার যেন শেষ হ'ত না। তাদের প্রত্যেকের মুখে একই কথা, কি করে এই পৃথিবীর লোককে পুঁজিবাদীর হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে? সকল কথাই শুনতাম কিন্তু একটি কথারও জবাব দিতাম না, কারণ যে যত বকে সে সেরূপ ভাবে কিছুই করে না। বকে যাওয়া আর কাজ করা এক নয়। দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মাঝেই জাহাজ বলি-দ্বীপে আসল, আমি সেই দ্বীপে নেমে অনেক কিছু দেখলাম এবং যতটুকু পারলাম ততটুকু নোটবুকে লেখেও নিলাম। কিন্তু, যে দিন একজন বেলজিয়ান্ আমাকে বলল "বন্ধু তুমি কি এখানেই জীবন কাটাবে?" সে দিনই ইচ্ছা হল বলিদ্বীপ পরিত্যাগ করি, কিন্তু সেদিন জাহাজ ছিল না। পরের দিন জাহাজ ছিল। আমি তার পর দিন সকাল বেলা জাহাজে গিয়ে উঠলাম এবং সুরবায়াতে এসে নামলাম।

মানুষের বাসনার যেমন অন্ত নাই, তেমনি করে পৃথিবীতে এমন অনেক

দেখার আছে যা দেখেও শেষ করা যায় না। সুরবায়াতে আসার পরই বেশি গরমের জন্য জ্বর হল। হোটেলে থাকাটা ভাল মনে করলাম না, তাই সুরবায়ার একমাত্র বাংগালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ভদ্রলোকের জন্মস্থান চট্টগ্রামে। তখনকার দিনে চট্টগ্রামের লোক হওয়াটাও একটা পাপ ছিল। আমি কিন্তু এসব কথা মোটেই জানতাম না। শরীর ভাল হয়ে গেলে সুরবায়ার নানা স্থান দেখে বেড়াতে লাগলাম এবং ঠিক করলাম কয়েক দিনের মাঝেই বড় বুদ্ধ দেখার জন্য রওয়ানা হব, কিন্তু বড় বুদ্ধ দেখা আমার হল না। ডাচ পুলিশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডিটেনসন কেম্পে আটক করল। আমার সংগে যত রকমের ফটো এবং অটোগ্রাফ ছিল সবই নিয়ে গেল। এসব নিয়ে কোথায় যে গেল তা তারা আমাকে জানানও কর্তব্য মনে করল না।

এটা কেনাডার ডিটেনসন ক্যাম্প নয়, এটা হল ডাচদের এশিয়াটিক ডিটেনসন ক্যাম্প। এই স্থানে জাপানী এবং তুরুক ছাড়া এশিয়ার আর সকলকেই এনে রাখা হয়। পূর্বেই বলেছি অত্যধিক গরমের জন্য আমার জ্বর হয়েছিল, এখানে এসে আবার জ্বর হবে বলেই মনে হল। মস্তবড় একটা টিনের ছাওয়া ঘর, তার চারিদিকেও টিন দিয়ে ঘেরা। এক পাশে একটা জলের পাইপ তাও দশটার পর বন্ধ হয়ে যায়। এমনি গরমে আমাকে নিয়ে আবদ্ধ করা হল।

পায়ের জুতা মোজা খুলে ফেললাম। কোট খুলে এক দিকে রেখে দিলাম। মাত্র সার্ট আর হাপ পেন্ট পরে সিমেন্ট করা মেজের উপর কতক্ষণ বসে থাকলাম। তারপর হল পিপাসা। জলের কল তখন বন্ধ ছিল। চারিদিক খুঁজে দেখলাম কোথাও জল নাই। ঘরের চারি পাশে টিনের বেড়াতে বেশ কাঁটা যুক্ত তার দিয়ে ঘেরাও করা ছিল। একটি মাত্র গেট। পালাবার পথ ছিল না। কতক্ষণ পর গেটের কাছে গিয়ে, জল জল, বলে

চিৎকার করলাম। যখন কেউ জল দিল না তখন গেটে পদাঘাত করতে লাগলাম। তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে গেল। উঠবার আর ক্ষমতা থাকল না, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

রেড-টেপ-ইজমের লোপ হওয়া অতি দরকার। যদি রেড-টেপ-ইজম না থাকত তবে আমাকে এত কষ্ট পেতে হ'ত না। চট্টগ্রামের ভদ্রলোক বাইরে চলে গিয়েছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ পান তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে জামিনে খালাস করবার জন্য পুলিশ ষ্টেশনে যান। সেখানে রেড-টেপ-ইজমের কৃপায় অনেক সময় কাটাতে হয়। অতি কষ্টে যখন তিনি জামিন হওয়ার আদেশ পেলেন এবং ডিটেন্সন ক্যাম্পে আসলেন তখন আমি জল পিপাসায় কাতর ছিলাম। ডিটেন্সন ক্যাম্প হতে বের হয়ে জল তৃষ্ণা নিবারণ করি এবং মোহিনী বাবুর ঘরে যাই।

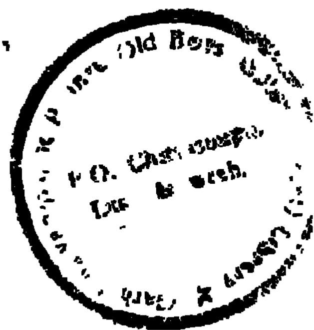
তিন দিন পর জাহাজ ছাড়বে। তিনটা দিন কাটানো আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠছিল। মোহিনী বাবু যদিও আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেই জামিন হয়েছিলেন তবুও আমার বাইরে যাওয়াটা তাঁর মোটেই পছন্দ হ'ত না। যারা বৎসরের পর বৎসর নিজের আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করে অন্তরীণে সময় কাটায়, তারা যে কত মনোবেদনা পায় এই তিন দিনেই তার আস্বাদ পেয়েছিলাম। সুখের বিষয় মোহিনী বাবু আমাকে ইমিগ্রেসন অফিসে এবং পুলিশ ষ্টেশনে যেতে দিতেন। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল, ইমিগ্রেসন বিভাগ গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিল, আমি এখন তাদের বাড়িতেই যাওয়া আসা করে সময় কাটাতে লাগলাম। বিদায়ের আগের দিন ইমিগ্রেসন অফিসার আমাকে বললেন "আপনার গ্রেপ্তারের জন্য আমরা দায়ী নই, এখানেও অনেক ইণ্ডিয়ান আপনার বিপক্ষে রিপোর্ট দিয়েছে।" আমরা বুঝতে পেরেছি রিপোর্টগুলি সবই মিথ্যা, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এবার আপনাকে সিংগাপুরে ফিরে যেতে হবেই। দরকার হলে আবার আসবেন।

বিদায়ের দিন পুলিশ আমার সংগে আসল। পথে কোন বন্দরে নামতে পারব না তাও জানিয়ে দিল। আমাকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে সাইকেল ও অটোগ্রাফ বইটা আমার হাতে দিয়ে একজন পুলিশ বলল "তাবে তুয়ান।"

জাহাজ ধীরে চলুক আর না চলুক তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার মত কিছুই ছিল না। জাহাজের ডেকে আমরা কজনা মানুষ ছিলাম, আর পাশেই ইয়া তগড়া কতকগুলি মহিষ এবং গরু ছিল। গরু এবং মহিষকে খাবারের জন্য জল এবং ঘাস দেওয়া হত, আর আমাদের শুটকি মাছ ভাজা আর ভাত খেতে দেওয়া হ'ত। গরম সহ্য করা অভ্যাস করব বলে এই গরমেও আমি স্নান করা বন্ধ করেছিলাম। আমি মানুষ নই বলে পথের দৃশ্যাবলী দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আমি শুধু শুয়েই থাকতাম। মাঝে মাঝে একজন ডাচ এসে বলতেন "এটা ত আমাদের দোষ নয়, আপনার দেশের লোকই আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিল, সিংগাপুরে গেলেই ফের আপনি স্বাধীন হবেন।" স্বাধীন! কে স্বাধীন হবে? আমি স্বাধীন হব, তবে কি আমার দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'য়ে গেল? আমার দেশ স্বাধীন না হলে আমি কি স্বাধীন হতে পারি? অসম্ভব কথা, একথায় হয় গাঁজা, নয় প্রতারণা আছে।

আমার যখন আর নড়বারও ক্ষমতা ছিল না, তখন এক দিন সকাল বেলা জাহাজ এসে সিংগাপুরে লাগল। যাত্রীর দল নেমে গেল। এবার জাহাজ বন্দর ছেড়ে অন্যত্র যাবে। আমি তখনও নামিনি, নামবার দরকার ছিল না। আমাকে খুঁজতে পুলিশ কেন অনর্থক কষ্ট করবে? এখান থেকেই ধরে নিয়ে যাক। কিন্তু পুলিশ আসল না। জাহাজ ছাড়ার পূর্বে সেই ডাচ লোকটি এসে বলল "আমি বলেছিলাম আপনি এখানে স্বাধীন, এখন নেমে যান নতুবা পিনাংএর ভাড়া দিন?" আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে জাহাজ হতে নেমে পড়লাম এবং অতি কষ্টে গৌরীশ চন্দ্র সিংহ রায়ের ঠিকানা বের করে তারই ঘরে গিয়ে

শুয়ে পড়লাম। তখন গৌরীশ যদিও যক্ষা রোগে ভুগছিল তবু তার মনে এমনই শক্তি ছিল যার জন্য আমি দ্বিতীয় বার নতুন তেজে পৃথিবী ভ্রমনে বের হতে সক্ষম হয়েছিলাম। গৌরীশ তুমি সত্যিই ছিলে শক্তির পরশ-মানিক।





গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

তরুণ তুর্কী	৩য় সংস্করণ	[illegible]
আজকের আমেরিকা	৩য় সংস্করণ	[illegible]
মরণবিজয়ী চীন	২য় সংস্করণ	[illegible]
[illegible] ঝুলি	২য় সংস্করণ	[illegible]
[illegible] কোরিয়া ভ্রমণ	২য় সংস্করণ	[illegible]
আফগানিস্থান ভ্রমণ	২য় সংস্করণ	[illegible]
অন্ধকার আফ্রিকা	২য় সংস্করণ	
বেদুইনের দেশে		[illegible]
প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি		২~
চার্লস ডিকেন্স, [illegible]	(ইংলিশ	৫~
আফ্রিকা [illegible]		১~

[illegible] প্রকাশনা [illegible]
১৩২, [illegible] রোড, [illegible]